দ্বি - মা সি ক
শ্রমিকবার্তা
৭ম বর্ষ-সংখ্যা ২৮ □ নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৩

ফিলিস্তিনমুক্ত ইসরাইল কীভাবে চাইছে নেতানিয়াহু

বিজয়ের লাল সূর্য এখনো আলো ফেলেনি যাদের জীবনে

পোশাক শিল্পে অস্থিরতা ন্যায্য মজুরি সমাধান

প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিক: সম্ভাবনাময় সমস্যাসংকুল খাত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এককালীন ও কিস্তিতে
ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে

" আর নয় ভাড়া বাড়ী
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
কিনলে চল কর্ণফুলী "

ফ্ল্যাট সাইজ

এ : ১২০০ বর্গফুট
বি : ১২০০ বর্গফুট
সি : ১২০০ বর্গফুট
ডি : ১২০০ বর্গফুট
ই : ১২০০ বর্গফুট
এফ: ১২০০ বর্গফুট

সম্পূর্ণ তৈরী প্লট, ফ্ল্যাট, বাড়ী এককালীন ও কিস্তিতে বিক্রয় চলছে........

REHAB MEMBER

KDPL

কর্ণফুলী ডেভেলপার্স (প্রাঃ) লিমিটেড

নিরাপদ বিনিয়োগ, হালাল ব্যবসা, উত্তম মুনাফা

01711-118298, 01941-856261
01716-170025

karnafuly.dpl@gmail.com
web: karnafulygroup.com

দ্বি-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

৭ম বর্ষ ■ সংখ্যা: ২৮
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৩

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আ ন ম শামসুল ইসলাম

সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
হাফিজুর রহমান
সোহেল রানা মিঠু
জামিল মাহমুদ
আব্দুর রহীম মানিক

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
আহমাদ সালমান

প্রচ্ছদ
ফরিদী নুমান

অলঙ্করণ
এম.এ. আকাশ

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২৩

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বা.জা.ফে-০৮
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org

মূল্য : ৪০ (চল্লিশ) টাকা

সূচিপত্র

অসহায়দের সহায়তা প্রদানে ইসলামের তাগিদ মাওলানা আবুল হাসেম মোল্লা	০৩
ফিলিস্তিনমুক্ত ইসরাইল কীভাবে চাইছে নেতানিয়াহু মাসুম খলিলী	০৬
বিজয়ের লাল সূর্য এখনো আলো ফেলেনি যাদের জীবনে মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান	১০
পোশাক শিল্পে অস্থিরতা ন্যায্য মজুরি সমাধান আশীষ মাহমুদ	১৪
প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিক: সম্ভাবনাময় সমস্যাসংকুল খাত ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ	১৭
শ্রমিক অসন্তোষ: রাজনৈতিক দলগুলোর দুঃখজনক নিষ্ক্রিয়তা আলী আহমাদ মাবরুর	২২
ট্রেড ইউনিয়নের রিটার্ন দাখিল ও নির্বাচন কবির আহমদ	২৫
আদর্শিক সংগঠনের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান	২৮
দায়ী ইলাল্লাহর গুণাবলি: সীরাত থেকে কতিপয় শিক্ষা আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ	৩১
হোটেল শ্রমিকের অধিকার ও বাস্তবতা অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মতিন	৩৫
প্রশ্নোত্তরে মজুরি ও মজুরি বোর্ড অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন	৩৭
দাস প্রথার আধুনিক সংস্করণ গৃহ শ্রমিক ড. মোঃ জিয়াউল হক	৩৯
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন: শ্রমিকের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি সোহেল রানা মিঠু	৪২
ফেডারেশন সংবাদ	৪৯

সম্পাদকীয়

চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে সাধারণ মানুষের জীবন আজ বিপর্যস্ত। এই সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষের ওপর। বিশেষভাবে বলতে হয় তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের কথা। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, তাদের ঘরে আজ হাহাকারের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আসছে। সরকার তার নিজের লোকদের নিয়ে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করেছে এই বছরের শুরুর দিকে। এই বোর্ড নানা টালবাহানা করে অবশেষে মালিকদের পূর্ণ স্বার্থ হাসিল করে গত ৭ নভেম্বর ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে ১২ হাজার ৫০০ টাকা। অযৌক্তিক ও অবাস্তব এই ঘোষণা শ্রমিকরা তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ জানিয়ে প্রত্যাখান করেছে। শ্রমিকদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছে দেশের প্রায় সকল শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। তারা এই মজুরি পুর্নবিবেচনার দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষের রেশ ছড়িয়ে গিয়েছে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল এলাকায়। বিক্ষোভ দমনে শ্রমিকদের বুকে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়েছে নারীসহ অন্তত ৩ জন শ্রমিককে। আহত ও পঙ্গুত্ববরণ করেছে অসংখ্য শ্রমিক। জানি না স্বাধীনতার আর কত বছর পার হলে শ্রমিকদের বুকের তাজা রক্ত পড়া বন্ধ হবে!

আজকের পৃথিবীতে মানবাধিকার বলতে কিছুই নেই। মানবাধিকার বলে যদি কিছু থাকতো তাহলে তো আজ ফিলিস্তিনের গাজায় উপত্যকায় হাজার হাজার বনি আদমের নির্মম মৃত্যু ঘটতো না। এক দখলদার রাষ্ট্রকে প্রশ্রয় দিয়ে শান্তিকামী মানুষের ওপর চলছে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন নিপীড়ন। নিষ্ঠুরতার এই কালো অধ্যায়কে পৃষ্ঠপোষকতা করছে ক্ষমতাশীল রাষ্ট্রগুলো। পৃষ্ঠপোষকদের প্রদান করা লাখ লাখ টন বোমার আঘাতে কোমলমতি শিশু-নারী, যুবক-বৃদ্ধ মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। গুঁড়িয়ে যাচ্ছে বাড়ি-ঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি হাসপাতাল ও অ্যাম্বুলেন্স।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে সৃষ্ট হওয়া রাজনৈতিক অস্থিরতা বয়ে চলছে আজ অবধি। দশকের পর দশক পেরিয়ে গেছে। এসেছে নেতৃত্বের পরিবর্তন। কিন্তু আজও দূর করা যায়নি রাজনৈতিক সংকট। দেশ রসাতলে যাক তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু ক্ষমতার মসনদ না পেলে সিদ্ধি হাসিল হবে না–এই মন্ত্রে বিশ্বাসী দেশের সকল রাজনৈতিক দল। যার ফলে স্বাধীনতার অর্ধশত বছর পেরিয়ে গেলেও স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার–আজ যেন সোনার হরিণ।

জানালায় উঁকি দিচ্ছে আরেকটি বিজয় দিবস। বিজয়ের দিবসের প্রাক্কালে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের। মুক্তি সেনানীরা আমাদের যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন– তার কতটা পূরণ করতে পেরেছি, তার জন্য আত্মজিজ্ঞাসা আজ বড়ো প্রয়োজন। বিজয়ের স্বপ্ন পূরণে কী করণীয় খুঁজে বের করতে হবে। বিজয়ের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে হৃদয় ও মননে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে আগামীর পথে।

অসহায়দের সহায়তা প্রদানে ইসলামের তাগিদ

মাওলানা আবুল হাসেম মোল্লা

পল্লী কবি জসিম উদ্দিন বলেছেন,
"সবার সুখে হাসব আমি, কাঁদব সবার দুঃখে
নিজের খাবার বিলিয়ে দিব অনাহারীর মুখে।"

এ যেন পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামেরই মূলকথা বিবৃত হয়েছে কবির ভাষায়। বাস্তবিক-ই ইসলাম মানব কল্যাণজনিত ধর্ম তথা জীবনব্যবস্থা। প্রকৃতিগতভাবেই মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে নানা বৈশিষ্ট্যে নানা ভিন্নতায় পরিচালিত করছেন। এখানে যেমন রয়েছে পারস্পরিক স্থান কালের ভিন্নতা, তেমনই রয়েছে সহায় সম্বলের স্বচ্ছলতা বনাম সীমাবদ্ধতা। যারা নিজেদের দৈনন্দিন কর্ম ও শ্রম তৎপরতার বিনিময়ে এমন সাবলম্বীতা লাভ করেন যাতে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার মতো সক্ষমতা অর্জিত হয়, তাদেরকে আমরা সহায় স্বচ্ছল হিসেবেই জানি; বিপরীতে যারা নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার মতো সক্ষমতা অর্জন করেন না, আমরা তাদেরকে অসহায় হিসেবে অভিহিত করে থাকি। সে সকল অসহায়ের প্রতি সাবলম্বীদের কী দায়িত্ব রয়েছে, ইসলাম এ ব্যাপারে কেমন তাগিদ প্রদান করেছে-নিম্মোক্ত আলোচনায় আমরা তা তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

কল্যাণকামী দীন : ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পূর্ণই একটা কল্যাণকামী দীন। রাসুল (সা.) বলেছেন, দীন হলো কল্যাণকামী। এ ব্যবস্থায় সবাই সবার মঙ্গল কামনা করবে– এটাই প্রত্যাশা। প্রচণ্ড শত্রুরও মঙ্গল কামনা করার জন্য এ দীনে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাহলে যে সকল ব্যক্তি নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার মতো সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন না– তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, উপকারের মনোভাব নিয়ে সহযোগিতা করা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা আলাদা বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ বলেন, "আর তারা আল্লাহকে ভালোবেসে খাদ্য দান করে মিসকিন, এতিম ও বন্দিদের। তারা বলে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদের খাদ্য দান করেছি, তোমাদের কাছে আমরা এর জন্য কোনো বিনিময় চাই না এবং কোনো কৃতজ্ঞতাও না" (সুরা দাহর: ৮-৯)। রাসুল (সা.) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি (প্রকৃত) মুমিন নয় যে তৃপ্তিসহ উদরপূর্তি করে অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে" (আল আদাবুল মুফরাদ : ১১১)।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার "ঈদ মোবারক" কবিতায় তেমনই সুর তুলে ধরেছেন–

"কারো আঁখি-জলে, কারো ঝাড়ে কি রে জ্বলিবে দীপ?
দু'জনার হবে বুলন্দ-নসীব, লাখে লাখে হবে বদ-নসীব?
এ নহে বিধান ইসলামের।"

বঞ্চিত অসহায়ের সহায়তা করা ছিল স্বয়ং রাসুল (সা.) বৈশিষ্ট্য : তৎকালীন আরব জাহেলী সমাজের চতুর্মুখী অপরাধের চিত্র দেখে রাসুল (সা.) যার পর নাই ব্যথিত ছিলেন। ভয়ংকর গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা পতনোন্মুখ জাতির অধঃপতনের আশু ভবিষ্যত দেখে তিনি শিহরিত হচ্ছিলেন। এমন এক প্রেক্ষাপটে হঠাৎ বিশালাকৃতির জিবরাইল (আ.) এর ওহি নিয়ে আগমন দেখে তিনি কিছুটা ভীত হয়ে পড়েছিলেন। হেরা গুহা থেকে তৎক্ষণাৎ ফিরে গিয়ে জীবন সঙ্গীনী খাদিজাকে (রা.) তাঁর শঙ্কার কথা ব্যক্ত করলেন। এমনাবস্থায় উম্মুল মুমিনিন খাদিজা (রা.) তাঁর যে গুণের কথা উল্লেখ করে তাকে সাহস যুগিয়েছিলেন তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম, কখনই নয়। আল্লাহ্ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন" (বুখারি: ০৩)। স্বয়ং বিশ্বনবি মুহাম্মদ (সা.) যেহেতু অসহায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাতেই অনুমিত হয় ইসলামে এর মহান

গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের অনেক জায়গায় সমাজের সব অসহায় দুঃস্থ, এতিম ও মজলুম মানুষের প্রতি সদয় হওয়ার তথা যথাযথ দায়িত্ব কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। অসহায় এতিমদের হক আদায় না করা এবং মিসকিনদের খাবার না দেওয়া লোকদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তুমি কি এমন লোককে দেখেছ, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? সে তো ওই ব্যক্তি যে এতিমের প্রতি রূঢ় আচরণ করে তাড়িয়ে দেয় আর মিসকিনদের খাবার প্রদানে মানুষকে নিরুৎসাহিত করে" (সুরা মাউন: আয়াত ১-৩)।

মানবতার কল্যাণে আবির্ভূত জাতি : আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কেরামগণকে লক্ষ্য করে গোটা মুসলিম জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ভূষিত করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে "উখরিজাত লিননাস" অর্থ্যাৎ মানবতার কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদায় যাদেরকে অভিষিক্ত করা হয়েছে– তারা দল, মত, গোষ্ঠী, স্থান কালের উর্ধ্বে উঠে অসহায় বঞ্চিত মানুষের সহায়তা করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখবে– এটাই স্বাভাবিক, আর ইসলাম সেটাই তার অনুসারীদের কাছে দাবি করে।

ধনীদের সম্পদে রয়েছে অসহায়ের অধিকার : আল্লাহ তায়ালা হলেন রাজাধিরাজ, পৃথিবীর একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। বিস্তৃত আকাশ জমিনের ত্রি-সীমানার ন্যূনতম একটা সুঁইয়ের মালিকও কোনো মানুষ নয়। তথাপি মহান মালিক, তাঁর অসীম জ্ঞানের হেকমতে কাউকে অঢেল সম্পদ দিয়ে থাকেন, আবার কাউকে পার্থিব জীবনের অস্বচ্ছলতায় রেখে বিশ্ব পরিচালনা করেন। এই যে সম্পদ কম দেওয়া-বেশি দেওয়ার এ মানবণ্টন; এটা কোনোভাবেই ব্যক্তির প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির চূড়ান্ত মানদণ্ড নয়। এটা শুধুই একটা পরীক্ষা, এটা তাঁর অনবদ্য হেকমতের দৃষ্টান্ত। কখনও চরম পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকেও তিনি এ দুনিয়ার প্রচুর সহায় সম্পদ দান করেন, আবার তাঁর চরম অনুগত বান্দাকেও কখনও কখনও অসহায় অবস্থায় রেখে দেন। সেজন্য সহায় স্বচ্ছল ব্যক্তির অর্জিত সম্পদে গর্বিত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই, চরম কার্পণ্যতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে অসহায়ের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের অনুমতিও তাকে মহান রব দেননি। অভাবীকে দান করা, সেবা করা– এটা অসহায়ের প্রতি করুণা প্রদর্শন নয় বরং আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নেয়ামত প্রাপ্তির শুকরিয়া হিসেবে অসহায়কে সহায়তা করা এটা তাদের প্রাপ্য অধিকার। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে রয়েছে যাচনাকারী এবং বঞ্চিতদের অধিকার" (সুরা যারিয়াত : ১৯)।

দুর্গম গিরিপথ পাড়ি দেওয়া দুঃসাহসিকতা : সমতল ভূমিতে সবাই চলতে সাচ্ছন্দ বোধ করে। কিন্ত কণ্টকাকীর্ণ, দুর্গম, চ্যালেঞ্জিং পথ পাড়ি দিতে অনেকেই সাহস করে না। এটা এক সংগ্রামী অভিযাত্রা। মহান রবের ভালোবাসায় যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারাই এমন ঝুঁকি বহন করার দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করতে পারে। অসহায়ের মুক্তি ও নিঃস্বকে খাবার দানের আন্দোলনে অদম্য ভূমিকা রাখার মতো এমন কাজকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এভাবেই চিত্রিত করেছেন। "কিন্তু সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি। তুমি কি জানো সেই দুর্গম গিরিপথটি কী? কোন গলাকে দাসত্বমুক্ত করা অথবা খাবার খাওয়ানো। অনাহারের দিনে কোন নিকটবর্তী এতিম বা ধূলি মলিন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো" (সুরা বালাদ : ১১-১৬)।

অসহায়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন আল্লাহ তায়ালা : হাশরের দিন খুবই ভীতিকর এক পরিবেশ কায়েম হবে। পৃথিবীর সকল মানুষ সেদিন ভয়ে তটস্থ হয়ে নিজের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়বে। মা, বাবা, স্ত্রী, স্বামী, সন্তান, ভাই, বোন কেউই কারো জন্য আফসোস করার মতো ফুরসতও পাবে না। সে চূড়ান্ত পরিবেশে রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার অসহায়ের পক্ষ হয়ে দুনিয়ার সাবলম্বীদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবেন। যার বর্ণনা জেনে হৃদয় প্রকম্পিত হওয়ার কথা। হাদিসে এসেছে, "আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিনে বলবেন, হে আদম সন্তান আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সেবা-শুশ্রুষা করনি। সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমার সেবা শুশ্রুষা করব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, আর তুমি তার সেবা করনি, তুমি কি জানতে না যে, তুমি তার সেবা-শুশ্রুষা করলে আমাকে তার কাছেই পেতে। হে আদম সন্তান আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমাকে আহার করাতে পারি? তুমি তো সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে আহার চেয়েছিল? তুমি তাকে খেতে দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে আহার করাতে তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে। হে আদম সন্তান আমি তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে (বান্দা) বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি কী করে তোমাকে পান করাব, অথচ তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানীয় চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। যদি তুমি তাকে পান করাতে, তবে তা আমার কাছে পেয়ে যেতে" (মুসলিম, ইফা : ৬৩২২)।

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা : অনেকের শারীরিক সক্ষমতা থাকলেও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের পরিবেশ না পাওয়ায় অসহায় হয়ে থাকতে হয়। সেজন্য ইসলাম উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে, যেন অসহায়ের যথাযথ অবলম্বন তৈরি করে দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে রাসুল (সা.) একটি ঘটনা সর্বজন বিদিত যা গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি নিজে তাঁর পবিত্র হাতে কুড়ালের হাতল লাগিয়ে দিয়ে একজন অসহায় ব্যক্তিকে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এতে অনুমিত হয় এ ব্যাপারে ইসলামের বিধান খুবই উপযোগী ও কার্যকর।

সমতল ভূমিতে সবাই চলতে সাচ্ছন্দ বোধ করে। কিন্তু কন্টকাকীর্ণ, দুর্গম, চ্যালেঞ্জিং পথ পাড়ি দিতে অনেকেই সাহস করে না। এটা এক সংগ্রামী অভিযাত্রা। মহান রবের ভালোবাসায় যারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারাই এমন ঝুঁকি বহন করার দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করতে পারে। অসহায়ের মুক্তি ও নিঃস্বকে খাবার দানের আন্দোলনে অদম্য ভূমিকা রাখার মতো এমন কাজকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এভাবেই চিত্রিত করেছেন। "কিন্তু সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি। তুমি কি জানো সেই দুর্গম গিরিপথটি কী? কোন গলাকে দাসত্বমুক্ত করা অথবা খাবার খাওয়ানো। অনাহারের দিনে কোন নিকটবর্তী এতিম বা ধূলি মলিন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো" (সুরা বালাদ : ১১-১৬)।

মিসকিনকে না খাওয়ানো জাহান্নামিদের বৈশিষ্ট্য : নশ্বর এ পৃথিবী থেকে বিদায়ের পর প্রতিটি মানুষকে অনন্তকালে জান্নাত অথবা জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে। বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষ জাহান্নামের ভয়ংকর আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ করে থাকে। এর কলিজা ভেদ করা আগুনের তীব্রতা, কাঁটাযুক্ত গরম পানি, রক্তপুঁজের নিকৃষ্টতা, যাক্কুম গাছের রসের বিষাক্ততা কল্পনা করতেই শরীর শিহরিত হয়ে উঠে। যারা মিসকিনকে খাবার দেয় না তাদেরকে সে ভয়ংকর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কুরআনের বাণী, "যারা জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখানে তারা জিজ্ঞেস করতে থাকবে অপরাধীদের– কিসে তোমাদের দোজখে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামাজ পড়তাম না। অভাবীদের খাবার দিতাম না" (সুরা মুদ্দাসিসর : ৪০-৪৪)। রাসুল (সা.) বলেছেন, "মানুষের কল্যাণ-সংশ্লিষ্ট যত কাজ আছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম হচ্ছে দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে খাবার দান করা" (বুখারি : ১২)।

মুজাহিদের সমান মর্যাদা লাভ : আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদদেরকে অনেক বেশি সম্মানিত করেছেন। কারণ তারা জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দীনের জন্য সংগ্রাম করে থাকেন। মহামহিম আল্লাহ তায়ালার নিকট মিসকিন অসহায়ের সহায়তাকারীর মর্যাদা এত বেশি যে, তিনি তাদেরকে মুজাহিদের সমান গণ্য করেন। রাসুল (সা.) বলেছেন, "বিধবা ও মিসকিন এর জন্য (খাদ্য যোগাতে) সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের ন্যায় অথবা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর সিয়াম পালনকারীর মত" (বুখারি, ইফা : ৪৯৬২)।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব : দুর্বল, অসহায়, মিসকিন, বঞ্চিত, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সাবলম্বীতার জন্য চেষ্টা করা এটা শুধু ব্যক্তির দায়িত্ব নয়। ব্যক্তির সাথে সাথে ইসলাম এ ব্যাপারে এতটাই গুরাত্বরোপ করেছে যে– এসব বিষয়ের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের-ই দায়িত্ব। রাসুল (সা.) বলেছেন, "তাই যখন কোন মু'মিন মারা যায় এবং মাল রেখে যায়, তা হলে তার যে আত্মীয়-স্বজন থাকে তারা তার ওয়ারিস হবে; আর যদি সে ঋণ কিংবা অসহায় পরিজন রেখে যায় তবে তারা যেন আমার নিকট আসে; আমি (রাষ্ট্র প্রধান) তাদের অভিভাবক" (বুখারি, ইফা : ২২৪১)।

ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপন, সহায় অসহায়ের সমন্বয়ে সুখ দুঃখের ভাগাভাগি করে একটা কাঙ্ক্ষিত সমাজ ও পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের চেয়ে উত্তম কোন মোটিভেশন আর হতে পারে না। অতএব পার্থিব সুখ, সমৃদ্ধি, শান্তি লাভ ও পরকালীন মুক্তির আশায় ইসলামী আদর্শের সৈনিক হওয়া ছাড়া আমাদের কোন বিকল্প নেই।

লেখক: ইসলামী চিন্তাবিদ

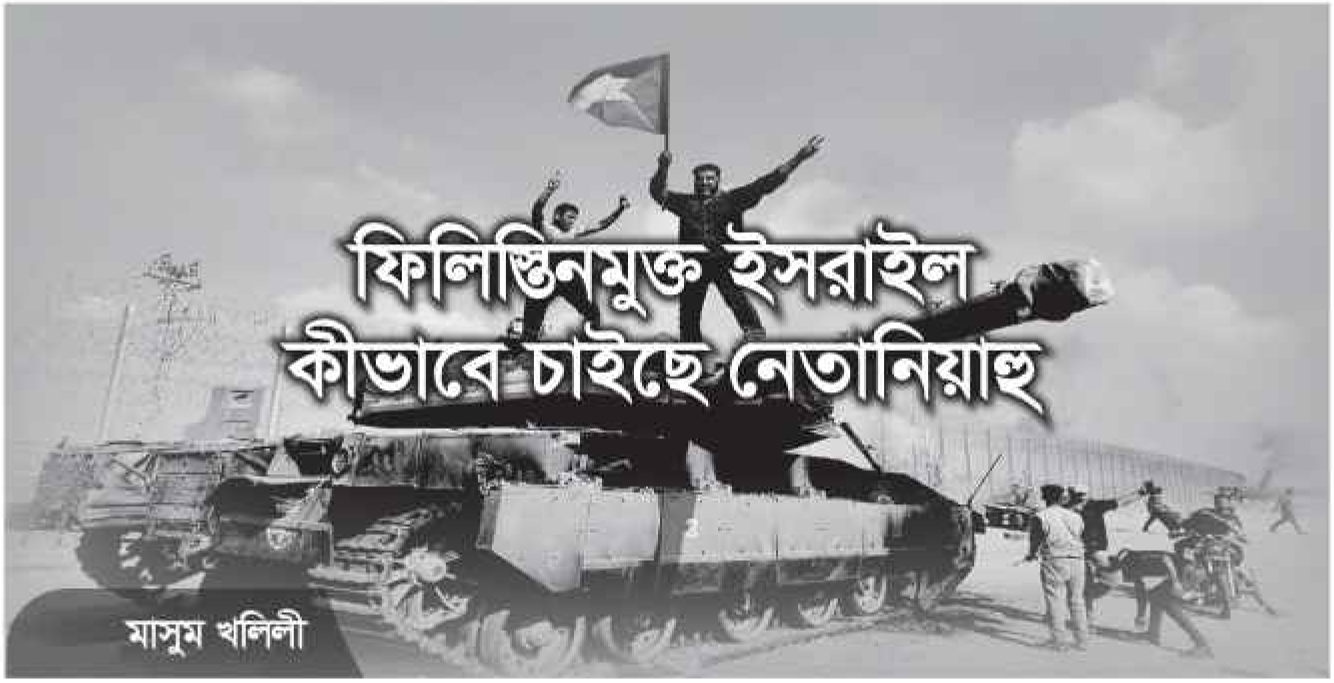

ফিলিস্তিনমুক্ত ইসরাইল কীভাবে চাইছে নেতানিয়াহু

মাসুম খলিলী

অনেকেই মনে করেন এবার ইসরাইল-ফিলিস্তিন যে যুদ্ধটা হচ্ছে সেটি ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসই শুরু করেছে। ঘটনা পরম্পরা দেখে সেটিই মনে হবে, কারণ এদিন হামাস যোদ্ধারা গ্লাডিয়েটর বেলুনে গাজার সীমান্ত পেরিয়ে ইসরাইলী সেনা বাহিনীর ওপর আক্রমণের পরই ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছেন। আর সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি বিমানবাহী রণতরী আর পরমাণুবাহী সাবমেরিন ভূমধ্য সাগরে হাজির হয়েছে। একই সাথে সেখানে এসেছে বৃটেন ফ্রান্স জার্মানি ইতালিসহ বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ জাহাজ। এই দৃশ্যপটকে যারা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবেন তারা নিশ্চিতভাবেই জানবেন যে, ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলন হামাস ইসরাইল আক্রমণ না করলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইসরাইল এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করতো যাতে ফিলিস্তিনিদের সাথে ইসরাইলের সংঘাত ও যুদ্ধ শুরু হতো। আর এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গাজা ও পশ্চিম তীর থেকে ফিলিস্তিনিদের মিসর ও জর্দানে ঠেলে দেওয়া হত।

ইসরাইলের আরব প্রতিবেশী দেশগুলো, ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ বা প্রতিরোধ সংগঠন হামাস সবাই তেলআবিব ও তার মিত্রদের এই পরিকল্পনার কথা জানতো। হামাস যেটি করেছে সেটি হলো এই আক্রমণের পুরো প্রস্তুতি নেবার আগেই কিছু সেনা সদস্যকে পণবন্দী করতে আঘাত হেনেছে ইসরাইলের উপর। আর সেই হামাসকে প্রত্যাঘাত করতে হেলিকপ্টার থেকে ফেলা বোমা ও গোলায় উৎসবে আসা বেসামরিক ইসরাইলীদের বহু সংখ্যক মারা গেছে। ইসরাইলী পুলিশের এক সাম্প্রতিক তদন্তে এই তথ্য ওঠে এসেছে। এর বিপরীতে ইসরাইল ও তার পাশ্চাত্য মিত্ররা যেভাবে গাজা ও পশ্চিম তীরের ওপর ঝাপিয়ে পড়েছে তাতে এই অঞ্চলকে একক ইসরাইলের সীমাভুক্ত করাই যে তাদের মূল টার্গেট সেটি বুঝতে আর বাকি থাকেনি। আর এ কারণে গাজায় ১৩ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করার পরও ইসরাইল বা যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে রাজি হচ্ছে না।

একক ইসরাইলের পরিকল্পনা

অসলো চুক্তি অনুসারে ১৯৬৭ সালের সীমানা নিয়ে একটি ফিলিস্তিন ও আরেকটি ইসরাইল রাষ্ট্র পাশাপাশি থাকার কথা। সে অনুসারে স্বায়ত্তশাসিত ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেটাকে পর্যায়ক্রমে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু যে উগ্র ইহুদি জাতীয়তাবাদী জায়নবাদের ভিত্তিতে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পরিকল্পনাকারীরা মধ্যপ্রাচ্যে একটি বৃহৎ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। বৃহত্তর ইসরাইল হল তালমুদ বাইবেলের রাজনৈতিক অর্থসহ একটি অভিব্যক্তি যা সময়ের সাথে ভিন্ন ও বিকশিত হয়েছে। এটাকে বলা হয় মধ্যপ্রাচ্যের জন্য জায়নবাদী পরিকল্পনা। জায়নবাদের প্রতিষ্ঠাতা থিওডোর হার্জলের মতে 'বৃহত্তর ইসরাইল' ধারণাটি এমন একটি ইহুদি রাষ্ট্র যা 'মিশরের বুক থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত' বিস্তৃত। এ হিসাবে এতে অন্তর্ভুক্ত হবে– ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন, দক্ষিণ লেবানন সিডন ও লিতানি নদী পর্যন্ত, সিরিয়ার গোলান হাইটস, হাওরান সমভূমি ও ডেরা, ডেরা থেকে আম্মান, জর্ডান ও আকাবা উপসাগর পর্যন্ত হেজাজ রেলওয়ে। অন্য অনেক জায়নবাদী বলে যে, বৃহত্তর ইসরাইল পশ্চিমের নীল নদ থেকে পূর্বে ইউফ্রেটিস (হাদিসে এই দুটি নদীকে জান্নাত থেকে নেমে আসা নদী বলা হয়েছে) পর্যন্ত ভূমিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার মধ্যে প্যালেস্টাইন, লেবানন, পশ্চিম সিরিয়া এবং দক্ষিণ তুরস্ক রয়েছে। এর অর্থ হল বৃহত্তর ইসরাইল মানে ফিলিস্তিনকে পুরোপুরি ইসরাইলে অন্তর্ভুক্ত করা। অনেক ইতিহাসবিদ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষক বলেছেন যে, এই কারণেই ইসরাইল ধীরে ধীরে এবং কৌশলগতভাবে তার প্রতিবেশী

বিশেষ করে ফিলিস্তিনের কাছ থেকে আরও বেশি ভূমি দখল করছে। ইসরাইল তার এই বৃহৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মিসরের সাথে ক্যাম্পডেভিড শান্তি চুক্তি এবং ফাতাহ আন্দোলনের সাথে অসলো শান্তি চুক্তি করলেও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রদান কোনো সময় তাদের পরিকল্পনার অংশ ছিল না। যার কারণে ইসরাইলের ক্ষমতায় আসার আগে থেকেই বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন। তিনি ও তার ডান ব্লকের সদস্যরা মনে করেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তারা বলে থাকেন, ইসরাইল একটি একক ইহুদি রাষ্ট্র হবে এবং ফিলিস্তিনিরা পার্শ্ববর্তী জর্দান ও মিসরে চলে যাবে। যারা এখানে থাকবে তারা বেদুইনদের মতো দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে থাকবে।

নেতানিয়াহু ক্ষমতায় আসার পর পরই তার মূল পরিকল্পনা বৃহৎ ইসরাইল প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন এবং পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুসালেমে অসলো চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে ইহুদি বসতি স্থাপন বাড়াতে থাকেন। ইউরোপ আমেরিকার কোন কোন দেশ এর মৃদু প্রতিবাদ করলেও পরোক্ষভাবে সেটি চালিয়ে যেতে দেওয়া হয়। জায়নবাদীদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানকে এক প্রকার মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে ফিলিস্তিন এজেন্ডা বাদ দিয়ে আরব দেশগুলোর সাথে একের পর এক শান্তি (অব্রাহাম) চুক্তি সম্পাদনের কাজ করা হয়। এই কাজে সরাসরি চাপ দেয় ওয়াশিংটন। এর আগে আরব বসন্তের নামে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে বিভিন্ন দেশের শাসন ব্যবস্থায় অস্থিরতা তৈরি করে ইসরাইলের সাথে চুক্তি করার জন্য বাধ্যবাধাকতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

এই অব্রাহাম চুক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই ছিল ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টাকে বিসর্জন দেওয়া। ট্রাম্পের শাসন এক মেয়াদে শেষ হয়ে গেলে তার অসম্পূর্ণ কাজ পড়ে জো বাইডেনের সরকারের ওপর। ইহুদি সম্প্রদায় থেকেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীসহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী বেছে নেন বাইডেন। এতে অব্রাহাম চুক্তির বাকি কাজ করতে আরব দেশগুলোকে বাধ্য করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। মরক্কোর পর সুদানের সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক স্বাভাবিক করা হয় বাইডেন সরকারের আমলে। এরপর সৌদি আরবের স্বীকৃতির বিষয়টাকে সামনে এগিয়ে নেওয়া হয়। সৌদি আরব স্বীকৃতি দিলে মধ্যপ্রাচ্যের সুন্নি বলয়ে উল্লেখযোগ্য সবারই এই দেশটিকে স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া হয়ে যাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়াই।

নেতানিয়াহু সরকারের পরবর্তী পরিকল্পনা হলো মসজিদুল আকসায় পর্যায়ক্রমে মুসলিমদের প্রবেশ বন্ধ করে দিয়ে সেখানে থার্ড টেম্পল স্থাপন করা। এটি করার তিনটি ধাপের মধ্যে দুটি ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়ে গেছে। চূড়ান্ত ধাপ সম্পন্ন করতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কুরবানি দেওয়ার জন্য ৫টি লাল গরু জেরুজালেমে নিয়ে আসা হয়। এই কুরবানির আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে একদিকে মসজিদুল আকসা চত্বরে ইহুদিদের তৃতীয় মন্দির স্থাপন করা হতো, অন্য দিকে পশ্চিম তীর ও গাজায় সর্বাত্মক আক্রমণ করে ফিলিস্তিনিদের মিসর ও জর্দানে তাড়িয়ে নেওয়া হতো। এই পরিকল্পনাকে বাধা দিতেই হামাস ৭ অক্টোবর ইসরাইলে এবারের অভিযান পরিচালনা করে। আর ইসরাইল ও তার মিত্রদের পুরো প্রস্তুতির আগে এই আঘাত হানা হলেও দেশটি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। সে সাথে সব কিছু নিয়ে ইসরাইলের সাহায্যে এগিয়ে আসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। নেতানিয়াহু যুদ্ধ ঘোষণা করে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে পরিবর্তন আনার কথা জানান। এতে বাধা দিলে তাদের দেশ ধ্বংস করার হুমকি দেন আরব নেতাদেরকে। এর অর্থ হলো নেতানিয়াহু ফিলিস্তিন ভূমি থেকে ফিলিস্তিনিদের উৎখাত করে সেটি সরাসরি ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে চাইছেন।

ইসরাইলী পরিকল্পনায় চার বাধা

অখণ্ড বৃহত্তর ইসরাইলের প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে মূল বাধা চারটি। প্রথমটি হলো, তারা গাজায় হামাস ও অন্যান্য প্রতিরোধ সংগঠনগুলোর যুদ্ধ ক্ষমতা সম্পর্কে যে ধারণা করেছিল বাস্তবে তাদের সক্ষমতা অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। যার ফলে যে সময়ের মধ্যে গাজার উপর ইসরাইল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে বলে ধারণা করেছিল তাতে প্রায় দেড় মাস যুদ্ধ চলার পরেও সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে। ইসরাইল এর আগেও গাজায় বিমান হামলা চালিয়েছে। তখন তাদের লক্ষ্য ছিল গাজাকে বংশাই করে রাখা। এ জন্য ১৭ বছর ধরে ২৩ লক্ষ মানুষের জনবসতির এই উপত্যকার ওপর অবরোধ আরোপ করে রাখা হয়। এবার ইসরাইলের বিমান হামলার লক্ষ্যবস্তু হলো সেখানে কোনো অবকাঠামো না রাখা। এ জন্য তারা প্রথমেই হামলার জন্য বেছে নিয়েছে হাসপাতাল ও স্কুলের মতো স্থাপনা। তারা যুক্তি দেখিয়েছে প্রতিটা হাসপাতালের নিচে হামাসের ঘাঁটি রয়েছে। অথচ ইসরাইলে ৬ সপ্তাহের যুদ্ধে এ ধরনের একটি ঘাঁটিও পায়নি। এরপরও গাজার সংসদ ভবন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্কুল ও হাসপাতাল সব গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরাইল।

যুদ্ধ শুরু করে প্রায় দেড় যুগ অবরুদ্ধ থাকা ছোট একটি উপত্যকায় পানি বিদ্যুৎ খাবার ঔষধপত্র বন্ধ করে দিয়ে একটি আবদ্ধ কারাগার বানিয়ে রাখা হয়। আর বিমান হামলায় বড়ো বড়ো সব অবকাঠামো ধ্বংস করার পর স্থল অভিযান শুরু করে ইসরাইল। এই স্থল অভিযানের শুরুতে উত্তর গাজা থেকে মিসর সীমান্তবর্তী দক্ষিণ গাজায় সব ফিলিস্তিনিকে চলে যেতে বলে ইসরাইল। আর একই সাথে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বড়ো বড়ো রাষ্ট্রগুলো মিসরকে রাজি করানোর জন্য নানা প্রলোভন দিতে থাকে। মিসরের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয় গাজার ফিলিস্তিনিদের মিসর গ্রহণ করে নিলে তাদের বকেয়া সব ঋণ মওকুফ করে দেওয়া হবে। এটি দেওয়া হয় যাতে দেশটি ফিলিস্তিনিদের সিনাইয়ে নিয়ে গিয়ে গাজাকে খালি করে দেয়। কিন্তু কায়রো ভালো করেই জানে একসময় তাদেরই অংশ গাজাকে ফিলিস্তিনমুক্ত করে ইসরাইলের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ হবে ইসরাইলের আক্রমণের পরবর্তী টার্গেট বানানো মিসরকে। মিসর রাজি না হলে একই প্রস্তাব সৌদি আরবকে দেওয়া হয়। অন্য দিকে জর্দানকে বলা হয় পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের গ্রহণ করার জন্য। এই তিন দেশের কোনটিই ফিলিস্তিনিদের গ্রহণ করতে রাজি হয়নি। এটি ইসরাইলের প্রস্তাব বাস্তবায়নের পথে দ্বিতীয় বাধা।

ইসরাইলের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে তৃতীয় বাধা হলো দেশটির গাজায় চালানো ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যার বিরুদ্ধে সৃষ্ট প্রবল বৈরি জনমত। অন্যান্য দেশের মত একই ধরনের জনমত সৃষ্টি হয়েছে

অখণ্ড বৃহত্তর ইসরাইলের প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে মূল বাধা চারটি। প্রথমটি হলো, তারা গাজায় হামাস ও অন্যান্য প্রতিরোধ সংগঠনগুলোর যুদ্ধ ক্ষমতা সম্পর্কে যে ধারণা করেছিল বাস্তবে তাদের সক্ষমতা অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। যার ফলে যে সময়ের মধ্যে গাজার উপর ইসরাইল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে বলে ধারণা করেছিল তাতে প্রায় দেড় মাস যুদ্ধ চলার পরেও সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে। ইসরাইল এর আগেও গাজায় বিমান হামলা চালিয়েছে। তখন তাদের লক্ষ্য ছিল গাজাকে বংশাই করে রাখা। এ জন্য ১৭ বছর ধরে ২৩ জনবসতির এই উপত্যকার ওপর অবরোধ আরোপ করে রাখা হয়। এবার ইসরাইলের বিমান হামলার লক্ষ্যবস্তু হলো সেখানে কোনো অবকাঠামো না রাখা। এ জন্য তারা প্রথমেই হামলার জন্য বেছে নিয়েছে হাসপাতাল ও স্কুলের মতো স্থাপনা। তারা যুক্তি দেখিয়েছে প্রতিটা হাসপাতালের নিচে হামাসের ঘাঁটি রয়েছে। অথচ ইসরাইলে ৬ সপ্তাহের যুদ্ধে এ ধরনের একটি ঘাঁটিও পায়নি। এরপরও গাজার সংসদ ভবন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্কুল ও হাসপাতাল সব গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরাইল।

ইসরাইলের ভেতরও। হামাস ইসরাইলের যেসব সামরিক বেসামরিক নাগরিকদের পণবন্দী করে নিয়ে গেছে গাজায় অব্যাহত বিমান হামলা ও গণহত্যা তাদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। হামাস যুদ্ধ বিরতি ও বন্দী বিনিময়ের প্রস্তাব দিলেও ইসরাইল তাতে রাজি না হওয়ায় হামাসের হাতে থাকা বন্দীরা অনিশ্চয়তার মুখে। আর ইসরাইলের সরকার নিজ জনগণের কাছে বার বার প্রতিশ্রুতি দিলেও অভিযান চালিয়ে এ পর্যন্ত একজন পণবন্দীকেও মুক্ত করতে পারেনি। অধিকন্তু ইসরাইলের হারেৎজ পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, হামাসের ৭ অক্টোবরের অভিযানের পর ইসরাইলের উৎসবে যেসব বেসামরিক ইহুদি মারা গেছে তাদের বড়ো অংশ ইসরাইলের ভুল করে এপাচি হেলিকপ্টার থেকে ফেলা বোমা ও গোলায় মারা গেছে। এসব কারণে ইসরাইলে আগে থেকে বিদ্যমান নেতানিয়াহুর প্রতি বিরূপ মনোভাব এখন চরম রূপ লাভ করেছে। এক দিকে যুদ্ধে ব্যর্থতা, অন্য দিকে দেশের ভেতরে বৈরি জনমত ইসরাইলের সরকারের সামনে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়া ইসরাইলের নির্বিচারে গণহত্যার চিত্র বিভিন্ন মিডিয়ার পাশাপাশি সামজিক গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে শেয়ার হবার ফলে ইসরাইলের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য ইউরোপীয় দেশে ইসরাইল বিরোধী জনমত তীব্রতা লাভ করছে। এই যুদ্ধে উগ্রভাবে সমর্থন দেবার কারণে বাইডেনের অ্যাপ্রুভাল রেট একবারে নিচে নেমে গেছে। বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের সংসদে এমপিদের বক্তব্যে যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ বাড়ছে। লন্ডন নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশে লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। এটি ইসরাইলের লক্ষ অর্জনে তৃতীয় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসরাইলের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে চতুর্থ বাধা হলো আরব ও ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে সৃষ্ট ঐক্য। ইসরাইল তার প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য নানাভাবে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে। আবার প্রতিবেশী দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে সংঘাত তৈরি করে রাখাও ইসরাইলের কৌশলগত ইনোন পরিকল্পনার অংশ। এ হিসাবে ইরান ও সৌদি আরব দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। আরব বসন্ত ও তার আগে নানা পদক্ষেপে ইরাক সিরিয়া ইয়েমেন লিবিয়া সুদানে গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়ে আছে। রাজতন্ত্র ও অন্যান্য একনায়ক শাসকদের সামনে গণতন্ত্রকামীদের উসকে হুমকি তৈরি করে কয়েকটি দেশকে চাপের মুখে ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে বাধ্য করা হয়েছে। এতকিছুর পরও এবার গাজায় যুদ্ধ শুরু করার পর আরব দেশগুলোর মধ্যে অভূতপূর্ব ঐক্য দেখা যাচ্ছে। আরব লীগ, আফ্রিকান ইউনিয়ন আর ওআইসি এই ইস্যুকে নিয়ে রিয়াদে বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন করেছে। সব দেশ একমত হয়ে গাজায় গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের নিন্দা করে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। এরপর ৭ প্রধান মুসলিম দেশের নেতারা যুদ্ধ বন্ধের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ হিসাবে বিভিন্ন দেশে যাওয়া শুরু করেছে, যার প্রথম গন্তব্য হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে চীনকে। মুসলিম বিশ্বের এই ঐক্য ইসরাইলের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পথে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিসরকে গলা টিপে হত্যার আয়োজন!

মিসর হলো ইসরাইলের সবচেয়ে শক্তিধর মুসলিম প্রতিবেশী। এ পর্যন্ত আরব ইসরাইল যত যুদ্ধ হয়েছে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তার প্রতিটি যুদ্ধে মিসরের নেতৃত্ব ছিল। ১৯৭৯ সালের আনোয়ার সাদাত প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ক্যাম্প ডেভিড শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে মিসরকে বৈরি দেশ থেকে ইসরাইলকে সহায়তা করার ধারায় নিয়ে আসা হয়। কিন্তু ইসরাইল মুখে মিসরের সাথে শান্তি শান্তি ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে দেশটিকে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে গলা টিপে মারার সব আয়োজন করছে।

এর মধ্যে মিসরকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার জন্য সুয়েজ খালের বিকল্প হিসাবে ইসরাইল বেনগরিয়ান ক্যানেল তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে যেটি চালু হলে মিসর প্রতি বছর সুয়েজ থেকে আয় করা ১০ বিলিয়ন ডলারের বড়ো অংশ হারাবে। এই ক্যানেলটি গাজার ওপর দিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনার কারণে গাজাকে আরবশূন্য করতে চায় ইসরাইল। এর বাইরে ইথিওপিয়ায় মিসরের কৃষি অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র নীল নদীর উজানে বাদ দিয়ে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করার কাজ শেষ করে আনা হয়েছে ইসরাইলের সহায়তায়। এই প্রকল্পের বিদ্যুৎ বাজারজাতকরণ এবং পানি ব্যবহার প্রকল্পগুলো পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসরাইলকে। ইসরাইল নীল নদীর পানি দেশটির পশ্চিম তীর, গাজা সহ ইসরাইলের মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে চাষাবাদের পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে নীল নদীর পানি থেকে বঞ্চিত হবে মিসর ও সুদান, যার মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে দেশটির উপর।

ক্যাম্প ডেভিড শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেবার পর থেকে এমনিতেই মিসরের নিরাপত্তা বাহিনী ও অর্থনীতির উপর রয়েছে ইসরাইল ও তার পৃষ্ঠপোষকদের গভীর নজরদারী ও প্রভাব। মিসরকে প্রতি বছর ২.৩ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়ে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী ও অর্থনীতিকে মূলত আমেরিকান অনুদান ও অস্ত্র নির্ভর করা হয়েছে। মার্কিন অর্থ সহায়তায় সুয়েজের বিকল্প ক্যানেল তৈরি হলে এবং নীল নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ ইসরাইলের হাতে চলে গেলে মিসর আরও বেশি পঙ্গু হয়ে যাবে।

পশ্চিম তীরের প্রতিবেশী জর্দান এমনিতেই সম্পদের দিক থেকে একটি দুর্বল রাষ্ট্র। সে দেশটিতে একটি প্রাসাদ অভ্যুত্থান ঘটানোর আয়োজন করে বাদশাহ আব্দুল্লাহর সামনে ক্ষমতাচ্যুতির হুমকি তৈরি করে রাখা হয়েছে। এর বাইরে আমেরিকান সেনাদের একটি ঘাঁটি করে রাখা হয়েছে সেখানে। ফলে জর্দানের চেয়েও এখন বেশি নজর রাখা হয়েছে মিসরের প্রতি। দেশটিকে ভূমধ্য সাগরের তেল গ্যাস সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার জন্য ইউরোপমুখী তেলগ্যাস পাইপ লাইন এবং বিআরআইয়ের বিকল্প মহাবাণিজ্য সংযোগ প্রকল্পের বাইরে রাখা হয়েছে মিসরকে।

ইরান ফ্যাক্টর ও আঞ্চলিক যুদ্ধের ঝুঁকি

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জকারী একমাত্র ক্ষমতাধর দেশ হলো ইরান। ইরানকে দুর্বল করার জন্য ইসরাইল ও তার মিত্ররা অবরোধ আরোপ থেকে শুরু করে এমন কোন পদক্ষেপ নেই যা নেয়নি। এসব ডিঙ্গিয়ে ইরান মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব বজায় রাখতে বিভিন্ন দেশে প্রক্সি বা ছায়াশক্তি গড়ে তুলেছে। ইরান সরাসরি এবার গাজা যুদ্ধে যুক্ত না হলেও ইরানের ছায়া শক্তি ইসরাইলের বিরুদ্ধে ক্রমেই সক্রিয় হচ্ছে। এর মধ্যে ইরানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত লেবাননের শিয়া মিলিশিয়া ও রাজনৈতিক দল হিজবুল্লাহ শেষ পর্যন্ত ইসরাইলের মুখোমুখি হতে পারে। হিজবুল্লাহ লেবাননের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি। এর সাথে ইতিমধ্যেই দু'দেশের সীমান্ত অঞ্চলে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) সাথে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত, উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু যদি ইসরাইলের এই আক্রমণে উল্লেখযোগ্য বেসামরিক হতাহত অব্যাহত থাকে, তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। হিজবুল্লাহ-ইসরাইল যুদ্ধ ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি যুদ্ধে টানতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সিরিয়া ও ইরাকে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে ইরান-সমর্থিত অন্যান্য গোষ্ঠীর হামলা এমন এক যুদ্ধে পরিণত হতে পারে যা আবারও ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স (মুকাওয়ামা ইসলামিয়া) নামে পরিচিত ইরাকে সম্মিলিত জোটভুক্ত দলগুলো মার্কিন বাহিনী যেখানে অবস্থান করছে সেখানে ড্রোন ও রকেট হামলার দায় স্বীকার করেছে। ২৬ অক্টোবর ও ৮ নভেম্বর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার স্থাপনায় পাল্টা আঘাত করে। এখন, কোনো পক্ষই উত্তেজনা বাড়াতে চায় বলে মনে হয় না, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হতাহতের ঘটনা সমীকরণ পরিবর্তন করতে পারে এবং এটি আঞ্চলিক যুদ্ধের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

তৃতীয়ত, ইসরাইল অধিকৃত ভূখণ্ডে আরেকটি যুদ্ধ ফ্রন্ট খুলতে পারে। এর ট্রিগার হবে পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা ফিলিস্তিনিদের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ। সেখানে ফিলিস্তিনিদের জন্য ইসরাইলি সরকার ক্রমাগতভাবে অস্বস্তিকর অবস্থা তৈরি করে রেখেছে।

বৃহত্তর আঞ্চলিক যুদ্ধের সম্ভাবনা কমানোর সবচেয়ে সুস্পষ্ট উপায় হল গাজায় ডি-এস্কেলেশন করা। আপাতত, ইসরাইল বা হামাস কেউই স্থায়ী যুদ্ধবিরতিতে রাজি বলে মনে হচ্ছে না। তবে হামাস যুদ্ধ বিরতির বিনিময়ে কিছু ইসরাইলি পণবন্দীকে মুক্তি দেওয়ার চুক্তি অন্তত কূটনীতির জন্য কিছুটা সময় নিতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে হামাসকে নিয়ে ইসরাইল কী করবে এমন প্রশ্নের কোনো সুস্পষ্ট উত্তর নেই। এটাও স্পষ্ট নয় যে ইসরাইলের এই অপারেশন গ্রুপটির সামরিক সক্ষমতা ধ্বংস করতে পারবে কিনা যাতে বেসামরিক জীবনহানি ইতিমধ্যেই অনেক বেড়েছে। গাজা উপত্যকাকে বোমা মেরে সমান করে দেওয়া, হাজার হাজার এমনকি লাখো নিরীহ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা এবং আঞ্চলিক যুদ্ধের ঝুঁকি ইসরাইলকে দীর্ঘমেয়াদে কোনভাবেই নিরাপদ রাখবে না।

এসব কারণে ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র পাল্টে দিয়ে আর আল আকসাকে করতলগত করার জন্য যে রক্তাক্ত যুদ্ধ শুরু করেছে সেটি অর্জন করা খুব সহজ নয়। এ ব্যাপারে নিবৃত না হলে মধ্যপ্রাচ্যে আরো রক্ত ঝরবে। মুসলিম দেশগুলো আরো ঐক্যবদ্ধ হবে। এমনকি এতে চীন ও রাশিয়াও যে মাত্রাতেই হোক না কেন সম্পৃক্ত হয়ে যেতে পারে। ফলে ইসরাইলের জন্য নেতানিয়াহু যে স্বপ্ন দেখছেন সেটি বাস্তবায়ন সুদূর পরাহতও হয়ে ওঠতে পারে। এর মধ্যে গাজার যুদ্ধে ইসরাইলের পরাজয় বা লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার নানা লক্ষণ ফুটে ওঠেছে। গাজার প্রতিরোধ যুদ্ধে জড়িতদের মুখে দৈব সাহায্যের নানা গল্প শোনা যাচ্ছে। ইসরাইলের যে ব্যাপক সামরিক ক্ষয়ক্ষতি দেখা যাচ্ছে তাতে সেটি বাস্তব বলে মনে হয়। ফলে চাইলেই ইসরাইল ফিলিস্তিনদের নিশ্চিহ্ন করে আল আকসা দখল করতে পারবে বলে মনে হয় না।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক।

বিজয়ের লাল সূর্য এখনো আলো ফেলেনি যাদের জীবনে

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

বিজয় একটি অতি প্রিয় শব্দ; যে কোনো বিজয় মানুষের হৃদয়ে আনন্দের দোলা দেয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বিজয়ের লাল পতাকা হাতে পেয়েছে। দীর্ঘ সংগ্রাম, লড়াই, আর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। সাম্য, মর্যাদা আর গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের তীব্র বাসনা থেকে স্বাধীকার আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎসারিত হয়। বিজয়– ভালো লাগা ভালোবাসার এক অতি প্রিয় শব্দ। এক বুক আশা আর আকাশসম প্রত্যাশাকে পুঁজি করে বিজয় অর্জন করেছে এ দেশের মানুষ। বিজয়ের বায়ান্ন বসন্ত পেরিয়ে আজো প্রতি ক্ষণে তার নতুন হিসেব মেলাতে গিয়ে লাভের ঝোলায় তেমন আশার কিছু পাওয়া যায় না। যে শিশুটি বিজয় দেখেনি, যে দেখেনি স্বাধীনতা যুদ্ধ কিংবা যদি বলি বিজয়ের পরের বসন্তে যার জন্ম সে আজ একান্ন বছর বয়সী এক বয়স্ক মানুষ। প্রত্যাশার পারদে আমাদের হতাশার নিক্তিটা সামনের দিকে ঝুলে আছে। বলা হয়ে থাকে ৭০-এর নির্বাচনী ফলাফল না মানার কারণে ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। আজ বাংলাদেশের হাজারো সমস্যার মাঝে সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক সমস্যা জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না। পারছে না, মতামত ব্যক্ত করতে। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে স্বাধীন চলাফেরায়ও বাধা-নিষেধ আরোপের বিষয়টি প্রায়ই নজরে আসে। স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদিজাকে এক বছরের অধিক সময় কারাগারে কাটাতে হয়েছে। সামান্য কয়েকটি টাকা ঋণ বকেয়া পড়ায় এ দেশে কৃষকের কোমরে রশি বেঁধে নিয়ে আনা হয়, যেখানে হাজার কোটি টাকা ঋণ খেলাপীরা মনের সুখে ঘুরে বেড়োয়। কাজের ন্যায্য মজুরি চাওয়ায় যেখানে পুলিশের গুলিতে জীবন দিতে হয়। বহুজাতিক কোম্পানির লোলুপ দৃষ্টি থেকে দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশকে বাঁচাতে এখানে শ্রমিককে জীবন দিতে হয়েছে। বিজয়ের বায়ান্ন বছর পেরিয়ে তেপ্পান্নতম দিবসে হতাশার কালো মেঘগুলো সামনে এসে দাঁড়ায়।

বিজয়ের তেপ্পান্ন বসন্তে এখনো প্রতিনিয়ত নির্যাতন নিপীড়নের শিকার শ্রমজীবী মানুষেরা। গার্মেন্টস শ্রমিকরা গুলি, টিয়ারসেল, জলকামান আর এ পি সি-র সামনে দাঁড়িয়ে যায় ন্যূনতম মজুরির অধিকার আদায়ের জন্য। আঞ্জুয়ারা খাতুন, রাসেল হাওলাদার আর জালালরা খুঁজে ফেরে দু'মুঠো ভাতের দাম, পরিণামে লাশ হয়ে ফেরে প্রিয়জনের কাছে। লাশ আর আহতদের গোঙানির পাশে দাঁড়িয়ে এখনো ওরা স্লোগান তোলে ন্যূনতম মজুরির জন্য। বিলাস-ব্যসনহীন জীবনে কোনোমতে বেঁচে থাকার নিরন্তণ সংগ্রামরত শ্রমজীবী মানুষগুলোর কাছে জীবনের মূল্য বোঝার মতো বোধ কতটুকু তা মোটা দাগের প্রশ্ন। জীবনের সব স্বপ্নকে যারা জলাঞ্জলি দেয় শুধু দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য। জীবন যুদ্ধ আর ঝুঁকিপূর্ণ লড়াইয়ে যারা দিনশেষে কখনো উনুন জ্বালায় আবার কখনো না খেয়ে দিন পার করে, তাদের কাছে বিজয় এবং বিজয় দিবসের কতটুকুই বা মূল্য আছে। নভেম্বর মাসের শুরুতে ঢাকার আশুলিয়া, উত্তরা, মিরপুর এবং গাজীপুরে গার্মেন্টস শ্রমিকরা ন্যূনতম তেইশ হাজার টাকা মাসিক বেতনের দাবিতে আন্দোলনে নামে। বিজিএমই কর্তৃপক্ষ যা নির্ধারণ করেছিল সাড়ে বারো হাজার টাকা। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে যা দিয়ে একটি ছোট পরিবারেরও এক মাসের শুধু খাওয়া খরচ জোটানো সম্ভব নয়।

অতি নিম্নবিত্ত মানুষেরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত শুধু তাদের বাজেট সংকোচন করেন। তাদের সংকোচননীতির বাজারের ঊর্ধ্বগতির সাথে তাল মেলাতে পারে না বলে অনেক সময়ই কুলিয়ে উঠতে পারে না। নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী মানুষেরা কম মূল্যের মধ্যে আগে

বিজয়ের তেপ্পান্ন বসন্তে এখনো প্রতিনিয়ত নির্যাতন নিপীড়নের শিকার শ্রমজীবী মানুষেরা। গার্মেন্টস শ্রমিকরা গুলি, টিয়ারসেল, জলকামান আর এ পি সি-র সামনে দাঁড়িয়ে যায় ন্যূনতম মজুরির অধিকার আদায়ের জন্য। আঞ্জুয়ারা খাতুন, রাসেল হাওলাদার আর জালালরা খুঁজে ফেরে দু'মুঠো ভাতের দাম, পরিণামে লাশ হয়ে ফেরে প্রিয়জনের কাছে। লাশ আর আহতদের গোঙানির পাশে দাঁড়িয়ে এখনো ওরা স্লোগান তোলে ন্যূনতম মজুরির জন্য। বিলাস-ব্যসনহীন জীবনে কোনোমতে বেঁচে থাকার নিরন্তণ সংগ্রামরত শ্রমজীবী মানুষগুলোর কাছে জীবনের মূল্য বোঝার মতো বোধ কতটুকু তা মোটা দাগের প্রশ্ন। জীবনের সব স্বপ্নকে যারা জলাঞ্জলি দেয় শুধু দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য। জীবন যুদ্ধ আর ঝুঁকিপূর্ণ লড়াইয়ে যারা দিনশেষে কখনো উনুন জালায় আবার কখনো না খেয়ে দিন পার করে, তাদের কাছে বিজয় এবং বিজয় দিবসের কতটুকুই বা মূল্য আছে।

ব্রয়লার মুরগি এবং পাঙ্গাস মাছ কিনে খেত। এ দুটি পণ্যের দাম বেড়ে যাবার পর তারা ডিম সবজীর ওপর ভরসা করেছে অনেক দিন। এখন ডিমও তাদের নাগালের বাইরে। বর্তমানে গার্মেন্টসগুলোতে শ্রমিকদের বেতন সর্বনিম্ন ছয় হাজার টাকা পর্যন্ত আছে। শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি তাদের বেতন বাড়াতে হবে। তারা আহামরি কোনো দাবি করেনি। বাজারের সাথে সঙ্গতি রেখে এতটুকু মজুরি নির্ধারণ করা হোক, যাতে তারা অন্তত একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পায়, দুবেলা খেতে পারে। একটি ছোট পরিবার যদি এক রুমের একটি বাসা ভাড়া নেয়, তাতেও ঢাকা এবং ঢাকার পার্শবর্তী এলাকায় পাঁচ থেকে ছয় হাজারের নিচে কোনো রুম পাওয়া যায় না। বাসা ভাড়া দেবার পর শুধু সবজি দিয়েও যদি দুবেলা পেটপুরে ভাত খেতে চায় তবে দুর্মূল্যের বাজারে বিশ-বাইশ হাজার টাকা প্রয়োজন। থাকা এবং খাবারের সংস্থান করার পর সন্তানদের লেখা পড়া করানো তাদের কাছে বিলাসিতাই মনে হয়। হররোজ যাদের জীবনে পরাজয়ের গ্লানি, নিরন্তর সংগ্রাম আর কষ্টের লোবানে পোড়া যাদের জীবন তারা বিজয়ের স্বাদ গন্ধ নেওয়ার সময় পাবে কখন?

শ্রমিকদের আন্দোলনের শুরু থেকেই পুলিশ ছিল মারমুখী। পুলিশ কেন গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রতি মারমুখো ছিল এর কোনো জবাব তাদের কাছে নেই। শ্রমিকরা প্রথম যখন রাস্তা অবরোধ করে তাদের সরাতে পুলিশ শক্তি প্রয়োগ করে। শক্তি প্রয়োগে সব সমস্যার সমাধান করা যেন পুলিশের নীতি হয়ে গেছে। পুলিশের গুলিতে অসংখ্য শ্রমিক আহত হয়। অর্ধমাস ব্যাপী চলা শ্রমিক আন্দোলনে মোট তিনজন শ্রমিক মারা যায়। এদের একজন আঞ্জুয়ারা খাতুন। আঞ্জুয়ারা খাতুন ছোট একটি সংসার। স্বামী-স্ত্রী দুজনই শ্রমজীবী মানুষ। দুজনের আয়ে কোনোরকমে সংসার চলে তাদের। ন্যূনতম মজুরি আদায়ের জন্য গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলন শুরু হলে অন্য অনেক শ্রমিকের সাথে আঞ্জুয়ার খাতুনও যুক্ত হয়। হাসপাতালে লাশ দেখতে গিয়ে তার স্বামী বলেছিল, আমার স্ত্রী তো রাজনীতি করে না। সে তো সরকার পতনের দাবি করেনি, মজুরি বৃদ্ধির দাবি করেছিলো। এ জন্য তাকে মেরে ফেলতে হবে? আঞ্জুয়ারা খাতুনের মৃত্যু এবং তার স্বামীর আক্ষেপের মাঝে অনেক জবাব লুকিয়ে আছে। শ্রমজীবী এই পরিবারটি মনে করে রাজনীতি করলে, সরকার পতনের আন্দোলন করলে তাদেরকে পুলিশ গুলি করতে পারে। গুলি করার অধিকার পুলিশের আছে, অথবা মনে হতে পারে, যারা সরকার পতনের দাবি করছে তাদের এই দাবি অন্যায় দাবি, অতএব তাদের মারা বা মেরে ফেলা বড়ো কোনো অপরাধ নয়। মূলত আমরা এক আজব ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সময়কে পাড় করছি। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর যে বিজয় অর্জিত হলো, তার মানে কি এই যে, এই দেশে রাজনীতি করলে বা সরকার পতনের দাবি করলে তাদের মেরে ফেলা যাবে? অথচ এ দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষের মনে এই চিন্তা ও ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এ দেশের মুক্তিকামী জনতা এই বিজয় তো চায়নি। তারা স্বাধীন জীবন যাপন, মুক্ত-স্বাধীনভাবে কথা বলা, নিজের মত প্রকাশ করা, নিজ দেশের

নাগরিক হিসেবে যে কোনো অধিকার ও ন্যায্যতা ফিরে পাবার জন্যই ১৯৭১ সালের বিজয় দিবসকে হৃদয়ের সবটুকু আবেগ দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলো। তেপ্পান্ন বছর পর আজও সেই একই প্রশ্ন আমরা আমাদের অধিকার কবে ফিরে পাবো?

গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনে তিনজন শ্রমিক মারা যাওয়া এবং শত শত শ্রমিক আহত হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশীয় মানবাধিকার সংগঠন, বুদ্ধিজীবী এবং যারা নিজেদেরকে সুশীল বলে দাবি করে তাদের তেমন কোনো জোড়ালো বক্তব্য আমরা পাইনি। তিনজন নিহত শ্রমিকের মধ্যে একজন ছিলেন নারী। বাংলাদেশে অনেকগুলো নারী সংগঠন আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, সামান্য কারণে তারা বক্তব্য, বিবৃতি, সমাবেশ, সেমিনার, মিছিল অনেক কিছু করেন। নিহত আঞ্জুয়ারা খাতুনের জন্য এই সকল নারীবাদী সংগঠনগুলোর কোনো তৎপরতা আমাদের চোখে পড়েনি। ঐ নারী শ্রমিক কোনো এলিট শ্রেণির সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। তার কোনো রাজনৈতিক দল নেই। নারীবাদী সংগঠনগুলোর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এভাবে হয়তো অনেকগুলো কারণ আবিষ্কার করা যাবে। এ সব কারণেই কি নারী সংগঠনগুলো আঞ্জুয়ারা খাতুনের জন্য তারা একটি বিবৃতি পর্যন্ত দিতে পারেননি? একইভাবে নানান বিষয়ে সোচ্চার মানবাধিকার সংগঠনগুলোও তিনজন শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়ে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে জানা যায়নি। এ দেশে যেন শ্রমিকের জীবনের কোনো মূল্য নেই। প্রশ্ন আসে তাদের রক্তের রং কি লাল নয়? তারাও কি অন্য আর দশজন মানুষের মতো বাঁচার অধিকার রাখে না? গর্ব এবং গৌরবের সুফল পাওয়ার অধিকারী কি তারা নয়?

বিগত বায়ান্ন বছরে দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে। মানুষের আয় বেড়েছে। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে অসংখ্য শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। সড়ক ও রেলপথে রাস্তার আয়তন বেড়েছে। বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে। রাস্তায় গণ পরিবহনের সংখ্যা বেড়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যাও বেড়েছে। অসংখ্য নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানে মানুষের কর্মসংস্থান বেড়েছে। এর বিপরীতে আনুপাতিক হারে বেকারত্বের পরিমাণ বেড়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ব্যাপকহারে এ দেশের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং শ্রমিক শ্রেণির নাগরিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছে। প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তাদের মাধ্যমে দেশে আসছে। গ্রামীন মাটির ঘরে আর কাঠের ঘরের পরিবর্তে সেখানে দৃষ্টি নন্দন দালান কোঠা নির্মিত হয়েছে। গার্মেন্টস সেক্টরে দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বেড়েছে। এর পাশাপাশি এই সেক্টরে শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতনের এন্তার অভিযোগ। এক শ্রেণির মালিক এই দেশে ব্যবসা করে বিদেশে বাড়ি গাড়ি করে আরাম আয়েশের বিলাসী জীবন কাটাচ্ছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সমায়ে উনিশ ধনাঢ্য পরিবারের কথা আলোচিত হতো। এখন কয়েক হাজার মাল্টি বিলিয়নার তৈরি হয়েছে। এর বিপরীতে ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাগজে কলমে খাদ্য সংকট কমে যাওয়ার কথা বলা হলেও ফুটপাতে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা কমার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখনো অসংখ্য বনি আদম ডাস্টবিনে খাবার খোঁজার চেষ্টা করে। ঋণ পরিশোধের জন্য সন্তান বিক্রির খবর প্রায়শ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঋণের বোঝা পরিশোধ করতে না পেরে আত্মহত্যার খবরও আমরা মাঝে মাঝে পত্রিকায় দেখি।

সামান্য খাবারের খোঁজে বনি আদম ডাস্টবিনে কুকুরের সাথে লড়াই করে। ফুটপাতে যার জীবন কাটে, চাকুরি না পেয়ে যে হতাশ যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় তাদের জীবনে বিজয় দিবস কী বার্তা দেয়। ভাত ও ভোটের অধিকার অধিকার দাবি করায় যারা লক্ষাধিক মামলা মাথায় নিয়ে দিন গুজরান করে তাদের জীবনে বিজয় দিবস কী বার্তা দেয়। যে শিশুটি জানে না, তার বাবা গুম হওয়ার পর কোথায় আছে, তার জীবনে বিজয় দিবস কী কোনো বার্তা বয়ে আনে। যে তরুণের বয়স আজ ত্রিশ বছর সে জীবনে একবারও ভোট দিতে পারেনি, তার জীবনে বিজয় দিবসের আনন্দ কতটুকু ফলদায়ক। ঘুমন্ত যুবককে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কোনো মামলা ছাড়াই ধরে নিয়ে যাবার সময় বলে আমার মা ও ছেলে অসুস্থ আমাকে নিয়েন না, তাঁর জীবনে বিজয় দিবসের ফলাফল আসলে কী। আমরা কিছু ভবন, কালভার্ট, সেতু আর টানেলের গল্প শুনি। মানুষের জীবনে আসলে কী উন্নয়ন হয়েছে? এমন হাজারো প্রশ্নের জবাব আসলেই আমাদের জানা নেই।

স্বাধীনতা পূর্ব আমলে আদমজী, বাওয়ানী, করিম প্লাটিনামসহ অসংখ্য বড়ো বড়ো পাট ও বস্ত্রকল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। ব্যক্তি মালিকানাধীন এ সব পাট ও বস্ত্রকলগুলো এক সময় লাভবান ছিলো। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এ সকল পাট ও বস্ত্রকল সরকারি মালিকানায় নিয়ে যাওয়ার পর এগুলোর কোনো উন্নয়ন হয়নি বরং অন্যায় দুর্নীতি আর লুটপাটের কারণে লোকসানের ঘানি টানতে হয়েছে। অন্যায় দুর্নীতি, চুরি, লুটপাট বন্ধ করার পরিবর্তে সরকারি মালিকানাধীন সব পাটকল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠেছে বেসরকারি মালিকানায় ব্যক্তি উদ্যোগে। এই সেক্টরের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আসে। যাদের ঘাম ও শ্রমে এই সেক্টর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তাদের জীবন জীবিকার প্রতি মালিক কিংবা সরকার কারোই সুনজর আছে বলে মনে হয় না। বিজয় দিবসের সুফল এই সকল শ্রমিকরা কতটুকু ভোগ করে; এই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচকই হবে।

সমস্যা, সংকট আর হতাশার দিকচক্রকালে ঘুরপাক খাচ্ছে দেশ মাতৃকার সুবিশাল এ অর্জন। স্বাধীনতা আর বিজয়ের গল্প শুনতে ভালোই লাগে। প্রত্যাশার ঝুলিতে আমরা কিছু জমা করতে পারছি না। অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন রাজনৈতিক সংঘাত সহিংসতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গোষ্ঠী নির্মূল আর প্রতিপক্ষকে ঘায়েলের এক অন্যায় কার্যক্রমকে বৈধতার রূপ দেওয়ার চেষ্টা আমরা অবিরতভাবে দেখছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে কিন্তু শিক্ষার মান কমেছে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু নৈতিকতা

ফুটপাতে যার জীবন কাটে, চাকুরি না পেয়ে যে হতাশ যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় তাদের জীবনে বিজয় দিবস কী বার্তা দেয়। ভাত ও ভোটের অধিকার অধিকার দাবি করায় যারা লক্ষাধিক মামলা মাথায় নিয়ে দিন গুজরান করে তাদের জীবনে বিজয় দিবস কী বার্তা দেয়। যে শিশুটি জানে না, তার বাবা গুম হওয়ার পর কোথায় আছে, তার জীবনে বিজয় দিবস কী কোনো বার্তা বয়ে আনে। যে তরুণের বয়স আজ ত্রিশ বছর সে জীবনে একবারও ভোট দিতে পারেনি, তার জীবনে বিজয় দিবসের আনন্দ কতটুকু ফলদায়ক। ঘুমন্ত যুবককে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কোনো মামলা ছাড়াই ধরে নিয়ে যাবার সময় বলে আমার মা ও ছেলে অসুস্থ আমাকে নিয়েন না, তাঁর জীবনে বিজয় দিবসের ফলাফল আসলে কী। আমরা কিছু ভবন, কালভার্ট, সেতু আর টানেলের গল্প শুনি। মানুষের জীবনে আসলে কী উন্নয়ন হয়েছে? এমন হাজারো প্রশ্নের জবাব আসলেই আমাদের জানা নেই।

সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বরং কমেছে। ধনীর সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু দরিদ্র আরো দরিদ্র হয়েছে। কৃষি প্রযুক্তি বেড়েছে, কৃষি উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু কৃষকের জীবনমানের কোনো উন্নয়ন হয়নি। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। থানা, কোর্ট ও বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বিচারহীনতার সংস্কৃতি আগের তুলনায় বেড়েছে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে আগের তুলনায় অনেক বেশি বক্তৃতা আর সেমিনার সিম্পোজিয়াম হচ্ছে কিন্তু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই। মানবীয় মূল্যবোধ, সততা নৈতিকতা লোপ পেয়ে সেখানে জিঘাংসা, প্রতিহিংসাপরাণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থাগুলোর জরিপে দুর্নীতিতে আমরা বরাবরই শীর্ষে থাকছি। এ দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা কী এ জন্য একটি স্বাধীন দেশ চেয়েছিলো? তারা বিজয়ের যে লাল সূর্য ছিনিয়ে এনেছিলো তা কি এ জন্য?

বিজয়ের প্রকৃত স্বাদ প্রতিটি মানুষের দোড় গোড়ায় পৌছে দিতে হলে প্রতিটি মানুষের অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে। মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোর সমস্যা সংকটগুলো দূর করতে হবে। একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। একটি আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য একদল আদর্শ মানুষের দরকার। আদর্শ মানুষ তৈরির জন্য আদর্শিক নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য। একটি মানুষ তিনি যে পেশার লোকই হোন না কেন, তার মধ্যে আদর্শ ও নৈতিকতার লালন করতে হবে। একটি শিশু জন্মের পর পর্যায়ক্রমে যখন বড়ো হতে থাকে সে তখন সর্বত্র শুধু বৈষম্য, অনৈতিকতা, অন্যায়, অনাচার আর দুর্নীতির মহোৎসব দেখে দেখে বড়ো হচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বত্র জুলুম, নির্যাতন আর নীতিহীনতার চাষাবাদ দেখে সে মূলত ভালো কিছু শিখতে পারে না। মানুষ তার সমাজ, পরিবার ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকেই মূল শিক্ষা গ্রহণ করে। এখানে যখন ইতিবাচক কিছু পায় না, তখন তার পক্ষে আদর্শ ও নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমজীবী শ্রেণি যখন সর্বত্র বঞ্চনা আর জুলুমের শিকার হয় তখন তার পেশার প্রতি কোনো আগ্রহ এবং ভালোবাসা তৈরি হয় না। সমাজে অবশ্যই সৎ, চরিত্রবান আদর্শ ও নীতিবান মানুষ আছে, কিন্তু অনৈতিকতার প্রবল বাত্যাপ্রবাহে এ সকল মানুষেরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। বিজয়ের প্রকৃত সুফল প্রতিটি মানুষের তরে পৌছে দিতে কৃষক, শ্রমিক, মুটে মজুর, ডাক্তার, আইনজীবী, প্রকৌশলী, কৃষিবিদসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শিখি। সকলের তরে ভালোবাসা প্রদর্শন করতে হলে আত্মস্বার্থ, আত্মপূজা আর লোভ মোহকে পরিহার করতে হবে। দেশ, জাতি ও মানবতার স্বার্থে আসুন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হই। কোটি কোটি মানুষ আজ তাদের গণতান্ত্রিক ও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত, আসুন সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে সকলে ঐক্যবদ্ধ হই। কাগজে কলমে গণতন্ত্র থাকলেও বাস্তবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে যার যার অবস্থান থেকে আমার স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করি। বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষক, শ্রমজীবী ও স্বল্প আয়ের মানুষ অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার, আসুন অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে দুর্নীতি ও লুটপাটের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলি। উন্নয়নের ডামাডোল আর সস্তা বুলি নয় এর সাথে মৌলিকভাবে দরকার সুশাসন, মানুষ ও মানবতার কল্যাণে সুশাসন নিশ্চিত করি। প্রতিহিংসা, জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন আর গোষ্ঠী নির্মূলের যে ভয়ংকর খেলা চলছে তা থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করতে শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবী সহ সকল স্তরের জনগণের মাঝে গড়ে তুলি সাম্য, সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। বিজয়ের হাসিতে উদ্ভাসিত হোক সকলের জীবন-এটাই প্রত্যাশা।

লেখক: কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

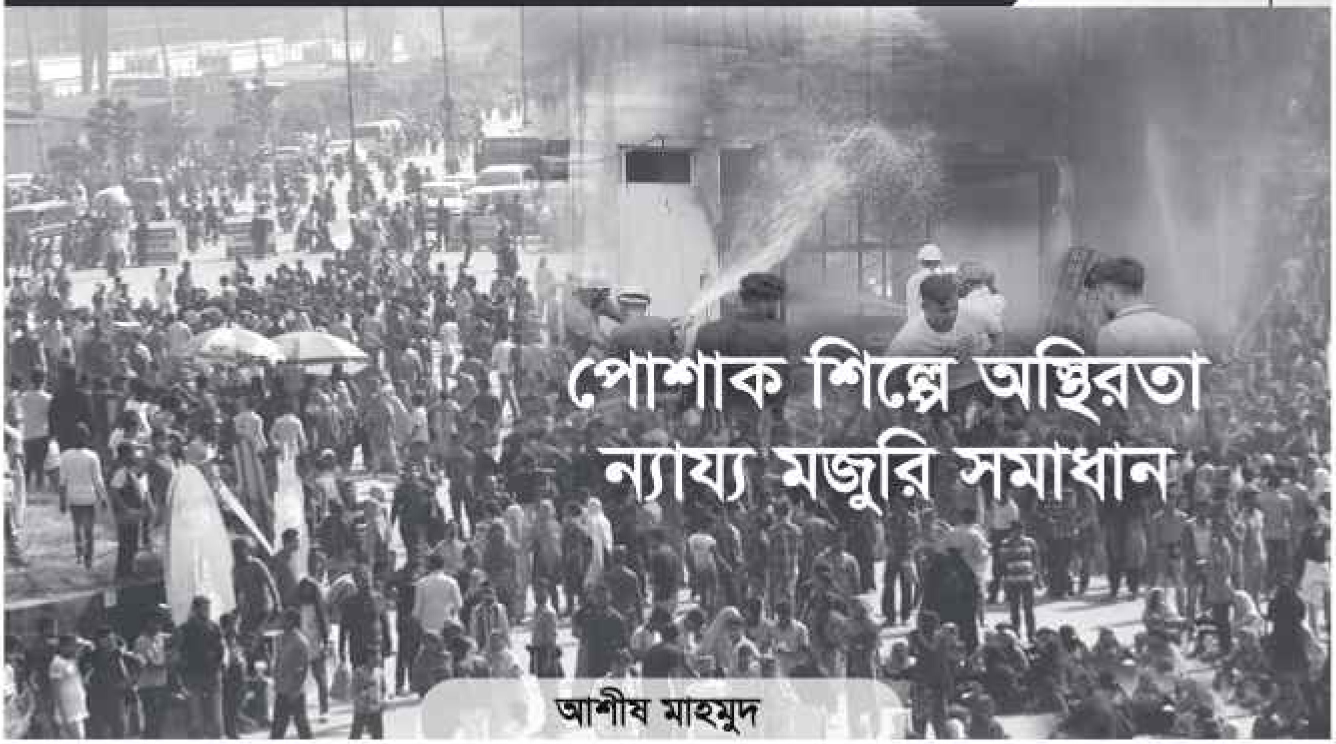

পোশাক শিল্পে অস্থিরতা ন্যায্য মজুরি সমাধান

আশীষ মাহমুদ

(ন্যায্য মজুরির দাবি করতে গিয়ে নিহত গার্মেন্টস শ্রমিক– রাসেল, আঞ্জুয়ারা ও জালাল উদ্দিন-এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।)

১

সায়েলা খাতুন। স্বামী ২ সন্তানসহ থাকেন রাজধানীর মিরপুরে। স্বামী পেশায় ভ্যান চালক। সন্তানরা স্থানীয় কওমী মাদরাসায় নুরানি বিভাগে পড়াশোনা করছে। সায়েলা মিরপুরের একটি গার্মেন্টেসে অপারেটর পদে কর্মরত। করোনার সময় গ্রামের বাড়ি চলে গেলেও টিকতে না পেরে আবার ফিরে এসে পুরানো গার্মেন্টেসে চাকরি নিয়েছেন। তার বেতন-ভাতা সর্বসাকুল্যে ১৩ হাজার টাকা।

আবু কাওসার। একটি গার্মেন্টেসের কাটিং মাস্টার। ঢাকায় স্ত্রী ও ৩ ছেলে-মেয়ে নিয়ে ভাড়া বাসায় বসবাস করছেন। সন্তানরা প্রত্যেকে স্কুলে পড়াশোনা করছে। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা-মা আছেন। তার বেতন সর্বসাকুল্যে ১৯ হাজার টাকা।

উভয়ের কাছে একটি মাত্র প্রশ্ন ছিল! জীবন কীভাবে চলছে? উভয়ে উত্তর এড়িয়ে গেলেন। বুঝতে কষ্ট হলো না কখন মানুষ কিছু প্রশ্ন শুনে থমকে যায়। কখনো মানুষের অন্তর ফেঁটে কান্না আসে কিন্তু সেই কান্নার কোনো রং থাকে না। কোনো শব্দ থাকে না।

২

৫৬ হাজার বর্গমাইলের বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। আবার যা সম্পদ আছে তার ব্যবহার আজও আমরা করতে পারিনি। আদোও করতে পারবো; এমন কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে জোর গলায় নিত্য নতুন শব্দের মোড়কে অনেক কথা বলতে পারলেও এখন পর্যন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন এবং ব্যবহার করার উপযোগী জনশক্তি তৈরি করতে দেশ যে ব্যর্থ হয়েছে; তা দিবালোকের মত স্পষ্ট।

দেশের এই দুর্দিনে রাষ্ট্রযন্ত্র সচল রাখার জন্য যে কয়টি শিল্প খাত সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে, তৈরি পোশাক শিল্প' তার সবার শীর্ষে। যদিও শুরুর দিকে পোশাক শিল্পের যাত্রা হয়েছিল অপ্রচলিত রপ্তানি খাত হিসাবে। স্বল্প পরিসর থেকে শুরু হওয়া পোশাক শিল্প থেকে দেশের রপ্তানি আয় এখন ৮৪ শতাংশ। অথচ মাত্র ৪৫ লাখ জনশক্তি এ খাতে নিয়োজিত। অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তি দেওয়া এই শিল্প দেশের মুদ্রাভাণ্ডারকে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে যাচ্ছে।

পোশাক শিল্পকে কেন্দ্র করে দেশের ব্যাংক-বীমা, হোটেল-পর্যটন, শিপিং, আবাসন, প্রসাধনীসহ নানা ব্যবসার বিকাশ ঘটেছে। দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড এই খাত বিশ্ব বাজারে সুনামের সাথে জয় করেছে ক্রেতাদের মন। সময়ের সাথে সাথে ক্রেতাদের চাহিদা বেড়েছে। আজ বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্প বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ (একক দেশ হিসাবে)। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) এর 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিভিউ ২০২৩' এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে– বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানি খাতের আরেক শীর্ষ দেশ ভিয়েতনাম থেকে ভালো করেছে। ভিয়েতনামের কাছে কিছুদিন আগে দ্বিতীয় স্থান হারিয়ে ফেললেও ২০২২ এ আবার পুনরুদ্ধার করেছে। প্রতিবেদন মতে বাংলাদেশ ২০২২ সালে ৪ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। যা বৈশ্বিক রপ্তানির ৭ দশমিক ৯ শতাংশ। ২০২১ সালে যা ছিল ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। ২০২২ সালে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১ দশমিক ৫ শতাংশ। অপর দিকে ভিয়েতনাম রপ্তানি করেছে ৩ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। বৈশ্বিক রপ্তানির যা ৬ দশমিক ১ শতাংশ। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে যথারীতি শীর্ষে অবস্থান করছে চীন।

৩

কুপির নিচে যেমন অন্ধকার। ঠিক তেমনিভাবে তৈরি পোশাক শিল্পের দ্বারা বাংলাদেশের অর্থনীতির উজ্জ্বল আলো জ্বললেও অন্ধকারে রয়েছে

কুপির নিচে যেমন অন্ধকার। ঠিক তেমনিভাবে তৈরি পোশাক শিল্পের দ্বারা বাংলাদেশের অর্থনীতির উজ্জ্বল আলো জ্বললেও অন্ধকারে রয়েছে গেছে এই পেশার মূল কারিগর তথা শ্রমিকরা। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অর্ডারও যাদের জীবনে স্বস্তি বয়ে আনতে পারেনি। নিশ্চিত করতে পারেনি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। প্রতিনিয়ত জীবন যুদ্ধে তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা পরাজয় মেনে নিয়ে ঘরে ফিরছে। তাদের হাহাকার শোনার জন্য কেউ নেই। রাষ্ট্র তো দুর্লভ অতিথি পাখি। ফলে কোনো মতে জীবন ধারণ করার জন্য তারা মালিকদের অত্যাচার নিপীড়ন-নির্যাতন মুখ বুঝে সহ্য করে যাচ্ছে। আজ বিশ্বের নামী-দামী মার্কেটের হ্যাঙারে ঝুলানো টিশার্ট-ডেনিম 'মেড ইন বাংলাদেশ' ট্যাগ দেখে মন যতটা উল্লাসিত হয় ততটাই গলির অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

গেছে এই পেশার মূল কারিগর তথা শ্রমিকরা। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অর্ডারও যাদের জীবনে স্বস্তি বয়ে আনতে পারেনি। নিশ্চিত করতে পারেনি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। প্রতিনিয়ত জীবন যুদ্ধে তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা পরাজয় মেনে নিয়ে ঘরে ফিরছে। তাদের হাহাকার শোনার জন্য কেউ নেই। রাষ্ট্র তো দুর্লভ অতিথি পাখি। ফলে কোনো মতে জীবন ধারণ করার জন্য তারা মালিকদের অত্যাচার নিপীড়ন-নির্যাতন মুখ বুঝে সহ্য করে যাচ্ছে। আজ বিশ্বের নামী-দামী মার্কেটের হ্যাঙারে ঝুলানো টিশার্ট-ডেনিম 'মেড ইন বাংলাদেশ' ট্যাগ দেখে মন যতটা উল্লাসিত হয় ততটাই গলির অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশ একক দেশ হিসাবে বিশ্বের দ্বিতীয় রপ্তানিকারক দেশ। দুঃখজনক হলেও সত্য দ্বিতীয় রপ্তানিকারক দেশ শ্রমিকদের পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে শীর্ষ দশে নেই! পোশাক রপ্তানির শীর্ষ দেশ চীন। চীনে পোশাক শ্রমিকের ন্যূনতম বেতন-ভাতা বাংলাদেশী টাকায় ২৪ হাজার ৮৯০। ভিয়েতনামে ১৫ হাজার ৬৬০ টাকা, তুরস্কে ২৯ হাজার ১৬৫ টাকা, মালয়েশিয়ায় ২৫ হাজার ৯৩৫ টাকা, কম্বোডিয়ায় ২৪ হাজার ২৮১ টাকা এবং ফিলিপাইনে ২৩ হাজার ১৮০ টাকা। তৈরি পোশাক খাতের দ্বিতীয় শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে যতটা গর্ব করতে ইচ্ছে করে ততটাই যেন হারিয়ে, যখন দেখি যাদের রক্তঘামের পরিশ্রমের বদৌলতে পোশাক শিল্প আজ মহিরুহঃ সেই শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন সর্বসাকুল্যে মাত্র ৮ হাজার টাকা! যা অন্যান্য দেশের তুলনায় যৎ সামান্য।

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের সর্বশেষ মজুরি ঘোষণা করা হয়েছিল ২০১৮ সালে। তখন এক বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। শ্রমিকদের দাবি ছিল ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা। শ্রমিকরা দাবির স্বপক্ষে রাজধানীসহ শিল্পাঞ্চল এলাকায় জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। মালিকরা বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের দিয়ে আন্দোলন থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারা শ্রমিক নেতাদের বাসায় বাসায় নানা ধরনের উপঢৌকন পাঠিয়েছিল। কিন্তু শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে মালিকদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তখন শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে মালিকরা মাত্র ১ হাজার ৬০ টাকা বাড়িয়ে ন্যূনতম মজুরির প্রস্তাব করেছিল। শ্রমিকরা যখন এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল তখন মালিক ও রাষ্ট্রযন্ত্র এক হয়ে রাতের আঁধারে শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের গণগ্রেফতারে নেমে আন্দোলন স্তমিত করে দেয়। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের মন জয় করার জন্য জাতীয় নির্বাচনের আগে সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রী আরও ১ হাজার টাকা বৃদ্ধি করে সর্বসাকুল্যে মজুরি ৮ হাজার টাকা নির্ধারণ করে দেন।

৪

সর্বশেষ মজুরি ঘোষণার সময় ডলার রেট ছিল প্রায় ৮৫ টাকা। সেই হিসাবে শ্রমিকরা ৯৪ ডলার বেতন ভাতা পেয়েছিল। ২০২৩ সালে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে ১২ হাজার ৫০০ টাকা। মালিকদের দাবি বেতন-ভাতা বাড়ানো হয়েছে ৫৬ শতাংশ। মালিকদের দাবি পুরোটাই ধোঁকাবাজি। প্রথমত এখন ডলার রেট প্রায় ১১২ টাকা। সেই হিসাবে শ্রমিকদের বেতন বাড়ানো হয়েছে মাত্র ১৮ ডলার। অন্যদিকে ২০১৮ সালে মজুরি ঘোষণার পর প্রতি বছর মূলবেতনের ৫ শতাংশ বৃদ্ধির পাওয়ার কথা। সেই হিসাবে গ্রেডভেদে শ্রমিকদের বাস্তব বেতন বেড়েছে ২৫-২৮.৮৮ শতাংশ। বেতন বৃদ্ধির এই চিত্র ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। একই সাথে সংস্থাটি বেতন কাঠামো পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে।

দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক এবং প্রায় সকল শ্রমিক সংগঠনঃ এমনকি সরকার সমর্থক শ্রমিক সংগঠনগুলো মনে করছে শ্রমিকদের বেতন কোনোভাবেই ২৩ হাজার টাকা নিচে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। করোনা পরবর্তী সময়ে বিশ্বের কিছু দেশ কৃত্রিম দুর্ভোগ সৃষ্টি করেছে। যার প্রভাব পড়েছে নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে। এসব দেশের মানুষরা সীমাহীন কষ্ট ভোগ করছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। এমন অবস্থায় দেশের প্রতিটি খাতের শ্রমিকরা বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে যাচ্ছে। শ্রমিকদের দাবি কোনো খাতেই আমলে নেওয়া হয়নি। দেশের বৃহৎ খাত তথা পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার বাধ্যবাধকতা ৫ বছর পরপর। সেই আইনের খাতিরে সরকার এ বছর ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করেছে। যে বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই আবার সরকার ঘনিষ্ঠ।

সুতরাং শ্রমিকরা আগেই জানতো, এই বোর্ড অতীতের মতো তাদের ঠকিয়ে দিবে। তাই শ্রমিকরা ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আগে থেকেই মাঠে ছিল। শ্রমিকদের অনুমান মিথ্যা হয়নি। শ্রমিকদের আন্দোলনের তেজ দেখে মালিকরা পাঁচ তারকা হোটেলে বিশাল মিটিং আয়োজন করে অপারগতা ও সামর্থ্যহীনতার গাল গল্প শুনিয়েছে। কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে হুংকার দিয়েছে, শ্রমিকরা কাজে না ফিরলে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার। সেদিন মালিকদের শীর্ষ সংগঠনের এক নেতা বলেছেন, 'আপনারা (সরকারি কর্মচারীরা) কালকে ঘুস বন্ধ করেন, আমরা পোশাক শ্রমিকদের বেতন বাড়িয়ে দেবো' (আজকের পত্রিকা, ২ নভেম্বর ২০২৩)। এই মালিক প্রকাশ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুললেও তার কথার প্রত্যুত্তরে রাষ্ট্র কিংবা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গরা একটি কথা বলেননি। আমি এতে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। অবশ্য মালিকের বিরুদ্ধে কথা বলার সুযোগ নেই। কারণ আজ ব্যবসায়ী-মালিকদের হাতে তো রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের হর্তাকর্তারা বন্দি। আজ তারাই সর্বেসর্বা। তাইতো রাষ্ট্র শক্তিশালী মালিকদের নিকট করুণভাবে আত্মসমর্পণ করে আবারও দায়সারাভাবে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে ১২ হাজার ৫০০ টাকা। আর মজুরি ঘোষণার জন্য এমন সময় বেছে নেওয়া হয়েছে, যখন দেশের মানুষের পুরো দৃষ্টি থাকবে জাতীয় নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে। শ্রমিকদের দিকে নজর দেওয়ার সময় কেউ পাবে না।

৫

দেশে আজকে চরম মুদ্রাস্ফীতি চলছে। সরকারি সংস্থার হিসাব মতে যা ৮.৩৭ শতাংশ এবং খাদ্যের দিকে যা ৭.৫৬ শতাংশ। যদিও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মতে মুদ্রাস্ফীতি ১২-১৫ শতাংশ। অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ ২০১৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকারি বাণিজ্য সংস্থা টিসিবির দাম পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন, 'চালের দাম বেড়েছে ১৫ শতাংশ, ডাল ১২০ শতাংশ, আটা ৮৮ শতাংশ, আলু ৮০ শতাংশ, খোলা সয়াবিন ৯৫ শতাংশ, লবণ ৬৮ শতাংশ, ডিম ৬৭ শতাংশ, দুধ ১০০ শতাংশ, চিনি ১৮০ শতাংশ, ব্রয়লার মুরগি ৪৮ শতাংশ এবং মাছ ১০০ শতাংশ। এই অবস্থায় ন্যূনতম মজুরির আয়ের একটি পরিবারের মাসিক ২০০ ক্যালরির জন্য ব্যয় করতে হয় ২৩ হাজার টাকা' (প্রথম আলো, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩)।

আরেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর ডায়ালগ' (সিপিডি)-এর এক গবেষণায় উঠে এসেছে, 'ঢাকায় বসবাসরত ৪ সদস্যের একটি পরিবারের জন্য মাসিক খাদ্য ব্যয় ২২ হাজার ৬৬৪ টাকা' (প্রথম আলো, ২৭ মার্চ ২০২৩)। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস)-এর মতে এই খরচ ১৪ হাজার টাকা। তবে সব গবেষণায় দাবি করা হয়েছে অন্যান্য খরচ মিলিয়ে একটি ৪ সদস্যের পরিবারের মাসিক ন্যূনতম ব্যয় ৪০ হাজার টাকার বেশি।

এই দুর্দিনে পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন কোনোভাবেই ১২ হাজার ৫০০ টাকা হতে পারে না। অথচ কম গুরুত্বপূর্ণ খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন পোশাক শ্রমিকদের তুলনায় দ্বিগুণ। রাষ্ট্রের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বেতন ১৬ হাজার ৯৫০ টাকা। ব্যাংকের পরিচ্ছন্নতাকর্মী-পিয়নসহ নিম্নপদের কর্মচারীদের বেতন ২৪ হাজার টাকা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের স'মিলের শ্রমিকরা গড়ে ১৮ হাজার টাকা পান। জাহাজভাঙা খাতের শ্রমিকরা ১৬ হাজার টাকা পেয়ে থাকেন। কিন্তু পোশাক শ্রমিকদের আটকে রাখা হয়েছে চিরচেনা বৃত্তে।

৬

শ্রমিকরা কি মালিক হতে চায়? নাকি মালিকদের মত বিলাসী জীবন চায়? দুটি প্রশ্নের উত্তর 'না'। শ্রমিকরা কোনো দিন স্বপ্ন পর্যন্ত দেখে না তারা মালিক হবে কিংবা মালিকদের মত করে বিলাসী জীবন অতিবাহিত করবে। তারা চায় পরিবার-পরিজন নিয়ে একটু ভালো থাকতে। শহরের ঝুপড়ি ঘরে না থেকে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে থাকতে চায়। অনাহারে অর্ধাহারে না থেকে পরিশ্রমের বিনিময়ে পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে চায়। রোগে আক্রান্ত হলে নিজ খরচে চিকিৎসা করতে চায়। সন্তানরা রাষ্ট্রের জন্য যেনো বোঝা না হয় সে জন্য সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষায় দিক্ষিত করতে চায়। তারা চায় না তাদের মৃত্যুর পর কাফনের কাপড়ের জন্য পরিবার অন্য মানুষের কাছে হাত পাতুক।

শ্রমিকদের চাওয়া খুব সামান্য। আর তাদের সামান্য চাওয়ার মধ্যে কোনো অন্যায় আবদার নেই। মালিকরা বিনিয়োগ করেছে বলে শ্রমিকরা কাজ পেয়েছে একথা যেমন ধ্রুব সত্য। ঠিক একইভাবে সত্য শ্রমিকরা নিষ্ঠার সাথে আপন দায়িত্ব পালন করছে বলে আজকে মালিকরা দ্রুত উন্নতি করতে পেরেছে। এখন মালিক যদি শ্রমিককে ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেয়, তাহলে পোশাক শিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে না। বরং শ্রমিকরা খুশি মনে মালিকের আয় বৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মালিকের ব্যবসা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

আর শ্রমিকরা অসন্তুষ্ট হলে বারংবার এ খাতে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। শ্রমিকরা কারখানা ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসবে। মালিকদের লেলিয়ে দেওয়া পুলিশের গুলি-টিয়ারশেলের আঘাতে অতীতের ন্যায় আরও আঞ্জুয়ারা, রাসেল ও জালালরা অকালে ঝড়ে পড়বে। অসংখ্য শ্রমিক পুলিশের নির্বিচার লাঠিচার্জে পঙ্গুত্ববরণ করবে। মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে অনেকের ঠাঁই হবে কারাগারে। এতে হয়ত সাময়িক আন্দোলন দমে যাবে কিন্তু যে বিষ বৃক্ষের সূচনা হবে তা একদিন মালিকদের ঘায়েল করবে।

সেদিন দেখতে না হলে, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিন। তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করুন। তাদেরকে আপন স্বজনের ন্যায় দেখুন। আশা করা যায় মালিক-শ্রমিক সম্প্রীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ আরও এগিয়ে যাবে। সকল শোষণ-বঞ্চনার অবসান হবে। নির্যাতন-নিপীড়ন ও কথায় কথায় শ্রমিক ছাঁটাই নামক শব্দগুলো অভিধান থেকে হারিয়ে যাবে।

সেদিন সায়েলা, কাওসারদের চোখে-মুখে কান্না নয়, প্রশান্তির হাসি ফুটে উঠবে। এজন্য শুধু চাই মালিকদের একটু আন্তরিকতা ও পরম ভালোবাসা। শ্রমিকরা মালিকদের ভালোবাসার মূল্য ঠিকই দিবে। মালিক-শ্রমিক মিলে গড়ে উঠবে সত্যিকার বাংলাদেশ।

এটাই হবে স্বাধীনতার সার্থকতা। সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ। এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

ইমেইল : mahmudashis@yahoo.com

প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিক: সম্ভাবনাময় সমস্যাসংকুল খাত

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে যারা অন্য কোনো দেশে পাড়ি জমিয়েছেন তাদেরকে সাধারণত প্রবাসী বাংলাদেশী বলা হয়। ভালো পরিবেশে বসবাস করা এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী করার আশায় বাংলাদেশীরা প্রবাসে পাড়ি জমায়। নানা স্বপ্ন, যন্ত্রণা-কষ্ট, পাওয়া-না পাওয়া, আনন্দ-বেদনা নিয়েই প্রবাসজীবনে তাদের পথচলা। সাধ-আহ্লাদ, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বাবা-মা-স্ত্রী-সন্তানের ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়ে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশে টাকা পাঠিয়ে স্বদেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছেন আমাদের এই রেমিট্যান্স যোদ্ধারা। প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে সৌদি আরবে সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়াও আরব বিশ্বের কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার ও বাহরাইনে প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশী প্রবাসী বসবাস করে। সেইসাথে মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ব্রাজিল, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, মালদ্বীপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপুল পরিমাণে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বসবাস। প্রক্রিয়াটি শুধু বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি নয়, দেশে বিপুল রেমিট্যান্স প্রবাহের অন্যতম উৎস। ২০০৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত এক কোটিরও বেশি শ্রমিক বিদেশে গেছেন। এখানে মধ্যপ্রাচ্যের ৯টি দেশে গেছেন প্রায় ৮০ লাখ। এর প্রায় ৪০ শতাংশ শ্রমিক গেছেন সৌদি আরবে। বাংলাদেশীরা সাধারণত টেকনিশিয়ান, গৃহস্থালী কর্মী, শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং চাকরিজীবী হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে যায়। এছাড়া বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার এবং চিকিৎসক রয়েছে। প্রবাসীদের অনেকেই নানা রকম সমস্যার মুখোমুখি। দেশের নারী অভিবাসী কর্মীসহ সকলের মর্যাদা, সামাজিক সুরক্ষা ও সম্মান সমুন্নত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত কর্তব্য। অভিবাসী কর্মীদের সেবা প্রদানে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-বিষয়ক সংসদীয় কমিটি এবং অন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয় নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বিশ্ব শ্রমবাজার ও বাংলাদেশ

জীবনমান উন্নয়ন এবং আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর অনেক লোক বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। তারা উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করে বৈদেশিক রিজার্ভকে সমৃদ্ধ করছেন। দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন, স্কুল-মাদ্রাসা, মসজিদ, হাসপাতাল স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডেও এ অর্থ ব্যয় হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য মতে, রেমিট্যান্স আয়ের প্রায় ৬৩ শতাংশ ব্যয় হয় দৈনন্দিন খরচের খাতে। এতে ওই পরিবারগুলো দারিদ্র্য দূর করতে পারে। রেমিট্যান্স পাওয়ার পরে একটি পরিবারের আয় আগের তুলনায় ৮২ শতাংশ বাড়ে। রেমিট্যান্স সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে বিনিয়োগের মাধ্যমে। প্রবাসীদের পরিবার-পরিজন অধিকাংশ গ্রামে বসবাস করেন। ফলে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় ও সঞ্চয় বাড়ার কারণে গ্রামীণ অর্থনীতির কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা বাড়ছে।

প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ার প্রেক্ষাপটে বাড়ে আমাদের রেমিট্যান্সও। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী আয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর শীর্ষ ১০ দেশের একটি। ১৯৬৭-৭৭ সালে প্রবাসী ছিল মাত্র ১৪ হাজার। ২০০৭-০৮ সালে তা পৌঁছে ৯ লাখ ৮১ হাজারে। তবে ২০০৮ সাল ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যা কমলেও ২০১৪ থেকে ২০১৬ সালের দিকে খানিকটা উন্নতি হতে শুরু করে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, ১৯৭৬ থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ কোটি ২১ লাখ ৯৯ হাজার ১২৪ জন নারী ও পুরুষ কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছেন। এর মধ্যে ২০০৯-২০১৮ সময়ে ৫৯ লাখ ৩৩ হাজার ৯৫ জন কর্মী বিদেশ গেছেন। তবে রেকর্ড পরিমাণ ১০ লাখ ৮ হাজার ৫২৫ জন কর্মী বিদেশ গেছেন ২০১৭ সালে। ২০২১

সালেই মোট ৬ লাখ ১৭ হাজার ২০৯ জন শ্রমিক বিভিন্ন দেশে গেছেন। ২০২২ সালে গেছেন ১১ লাখ ৩৬ হাজার। ২০২৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৮ লাখ ৮২ হাজার বাংলাদেশী বিদেশে গেছেন। সরকারি হিসেবের বাইরেও অনেক বাংলাদেশী আছেন যাঁরা বিভিন্ন উপায়ে বিদেশে গেছেন এবং বৈধ-অবৈধভাবে সেখানে অবস্থান করছেন। তাই প্রবাসী কর্মীর প্রকৃত সংখ্যা সরকারি হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি হবে বলা যায়। আবার অনেকে প্রবাসে স্থায়ীভাবে সপরিবারে বসবাস করলেও নিয়মিত দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়ে থাকেন।

দেশের অর্থনীতির বৈদেশিক আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশ আসে গার্মেন্টস ও প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ থেকে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে বেড়ে দেশের মূল অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এক হাজার ৮২০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে সব মিলিয়ে প্রবাসী আয় এসেছিল প্রায় দুই হাজার ৪৭৮ কোটি ডলার। এটা কেবল বৈধভাবে পাঠানো টাকার হিসেব। এর বাইরে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশে আসে বিভিন্ন উপায়ে। এর অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে হুন্ডি।

ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সুবিধাসৃষ্টির চেষ্টা চলছে। মানব পাচার বন্ধে ২০১২ সালে আইন প্রণীত হয়েছে। ২০১৩ সালে নিরাপদ অভিবাসন আইন প্রণীত হয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সির কার্যকলাপ দেখে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়কে দেখার জন্য আছে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। মালদ্বীপে কর্মরত অভিবাসী শ্রমিকের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন হয়েছে। তবে কর্মপরিবেশ-সংক্রান্ত এবং তাদের কর্মসংস্থান ম্যাট্রিক্সে নানা দিকে তারা বিভিন্ন জটিলতার মুখোমুখি হয়ে আসছেন। প্রবাসীদের কল্যাণ ও তাদের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রবাসী কল্যাণ শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রবাসীগণ হয়রানির শিকার হলে এই শাখার মাধ্যমে তদন্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোনো প্রবাসী বিদেশে মৃত্যুবরণ করলে তাদের উত্তরাধিকারীগণকে সহজে আর্থিক সুবিধা প্রদানে প্রবাসী কল্যাণ শাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড প্রবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সুরক্ষায় অনেক সেবা দেয়। হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে বঙ্গবন্ধু ওয়েজ আর্নার্স সেন্টার আছে। সেখানে প্রবাসী কর্মীদের জন্য নিরাপদে মাত্র ২০০ টাকায় আবাসনের সুযোগ রয়েছে। ২০২৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত ২ হাজার ৯৩ জন প্রবাসী কর্মী এ সেবা গ্রহণ করেছেন। বিদেশফেরত অসুস্থ কর্মীদের সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা করে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের এসএসসি ও এইচএসসি ক্যাটাগরিতে বার্ষিক যথাক্রমে ২৭ হাজার ৫০০ ও ৩৪ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রবাসী কর্মীর প্রতিবন্ধী সন্তানদের মাসে ১ হাজার টাকা ভাতা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া বিদেশ থেকে মৃতদেহ দেশে আনা, লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ ৩৫ হাজার টাকা প্রদান এবং মৃতের পরিবারকে ৩ লাখ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদানসহ বিভিন্ন সেবা দেওয়া হয়। কর্মীদের মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, বকেয়া বেতন ও ইনস্যুরেন্সের অর্থ আদায়ের জন্য দূতাবাসের সহায়তায় মামলা পরিচালনা করা হয়। ক্ষতিপূরণ মামলার কাগজপত্র তৈরিতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে একটি লিগ্যাল সেল রয়েছে। এর মাধ্যমে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি তৈরিতে কর্মীদের পরিবারকে সহায়তা করা হয়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে বিদেশগামী সব কর্মীকে বীমার আওতায় আনা হয়েছে। ২০২৩ সালের বছরের জুলাই পর্যন্ত বিমাকৃত কর্মীর সংখ্যা প্রায় ২৬ লাখ ৭৯ হাজারের বেশি। শ্রমকল্যাণ উইংয়ের মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদান করা ও শ্রম কল্যাণ উইংয়ে প্রতিবছর অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়।

২০২৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন ও হেলভেটাস-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি ও প্রথম আলোর আয়োজনে 'অভিবাসী শ্রমিকের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারের সুযোগ : আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অভিবাসী শ্রমিকের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। সরকার প্রদত্ত সুবিধাসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রধান দায়িত্ব শ্রমকল্যাণ উইংয়ের। বিশ্বের ১৬৮টি দেশে বাংলাদেশী কর্মীরা গেলেও তাঁদের সুরক্ষা ও অধিকার রক্ষায় ২৬টি দেশের বাংলাদেশ মিশনে শ্রমকল্যাণ উইং আছে মাত্র ২৯টি। এর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব এবং ইতালিতে দুটি করে শ্রমকল্যাণ উইং আছে। আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের ব্যবহারের জন্য সরকার এখন ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছে এবং অর্থ পাঠানোর প্রক্রিয়া আগের চেয়ে সহজ করা হয়েছে। কিন্তু এর পরও প্রবাসীরা বাংলাদেশে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হুন্ডিকে প্রাধান্য দেন। ২০০৬ সালে গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্টের (জিইপি) এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে পাঠানো প্রবাসী অর্থের ৫৬ শতাংশই আসে হুন্ডির মাধ্যমে। প্রবাসীদের হুন্ডি ব্যবহারের প্রবণতার অনেক কারণ আছে। ব্যাংকের চেয়ে বেশি অর্থ পাওয়া ও কোনো জটিলতা না থাকা প্রধানতম। তবে অনেক অবৈধ প্রবাসী আছেন যাঁরা প্রয়োজনীয় কাগজের অভাবে বাধ্য হয়েই হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠান। কিন্তু এর বাইরেও কিছু বিষয় আছে, যা প্রবাসীরা বিবেচনায় নিয়ে থাকেন। বিদেশে থাকাকালে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী দূতাবাসের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পাওয়া, দেশের বিমানবন্দরে নাজেহাল হওয়া, লাগেজ চুরি বা হয়রানি ইত্যাদি বিষয় তাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে; যা অস্বীকার করার উপায় নেই। পাসপোর্ট নবায়নে মাসের পর মাস লাগে; ফলে অনেকের কর্মক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আবার বিদেশে থাকাকালে কোনো ধরনের সমস্যা হলে ওই দেশের বাংলাদেশী দূতাবাসের অবহেলা করার অভিযোগও রয়েছে। এমনকি প্রবাসে দেশের দূতাবাসের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করতেও বিড়ম্বনা পোহাতে হয় বলেই অনেকে বলেন। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশে থাকা অদক্ষ বা স্বল্প শিক্ষিত শ্রমিকদের এমন অভিজ্ঞতা অনেক। এমনকি বিভিন্ন সেবার ফি নিয়েও আছে তাদের অভিযোগ।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকদের বিশাল অংশের গন্তব্য মূলত সৌদি আরব, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ইরাক, লিবিয়া, বাহরাইন, ওমান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিশাস, স্পেন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, লেবানন ইত্যাদি কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রবাসীরা প্রায় সময় নানাভাবে বঞ্চনা, শোষণ, অবহেলা ও নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। কখনও কখনও নির্যাতিত হচ্ছেন আবার অনেকেই ন্যায়বিচার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। কোনো কোনো দেশের কারাগারে বাংলাদেশীরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছেন।

অভিযোগ আছে যে, বাংলাদেশী প্রবাসীদের সুরক্ষা নেই, ন্যায়বিচার নেই, মর্যাদা নেই। বিদেশি দূতাবাসে সাধারণ মানুষের জন্য যে বাথরুম, সেখানে দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসবে। অভিবাসী শ্রমিকদের শোষণের ক্ষেত্রে একটা চক্র রয়েছে। পাসপোর্ট অফিস থেকে এটা শুরু হয়। বিদেশে যাওয়ার জন্য খোঁজখবর নেওয়া, যাওয়ার প্রস্তুতি, বিদেশে পৌঁছানো, কোনো কারণে বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর পুনঃঅন্তর্ভুক্তকরণ; এ ধরনের প্রতিটি পর্বেই সমস্যা। বিদেশে যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষ সাধারণত যে দালাল ধরেন, সেই দালাল নিজেও কিছু জানেন না। বিএমইটিতে তিন দিনের প্রশিক্ষণ নিতে হয়। কিন্তু এখানে যাঁরা প্রশিক্ষণ দেন, তাঁদের বিদেশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে।

নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি প্রবাসী বাংলাদেশীরা। অনেক সময় দালালের খপ্পরে পড়ে এক সময় ভিসা পাসপোর্ট সবই হারাতে হয়। আবার আমাদের দূতাবাসের পক্ষ থেকেও সঠিক সময়ে সঠিকভাবে সহযোগিতা না পাওয়ায় ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ প্রবাসীদের। পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায় যে শ্রমিকেরা প্রতারিত হয়েছেন। নৌকায় সাগর পাড়ি দিয়ে কোনো একটি দেশে যাওয়ার সময় পানিতে ডুবে মৃত্যু হচ্ছে। আবার নির্দিষ্ট দেশে যাওয়ার পর দেখা গেল, সেখানে তাঁদের কাজ নেই। তাঁদের কোনো একটি এলাকায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বিদেশগামীদের অধিকাংশই অদক্ষ হওয়ায় বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকরা হাড়ভাঙা খাটুনি করেও ন্যায্য বেতন পাওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছেন।

অভিবাসন একধরনের ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। যাঁরাই অভিবাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাঁরাই এখানে মুনাফা করছেন। সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যাওয়ার খরচ সবচেয়ে বেশি। আবার তাঁদের বেতন সবচেয়ে কম। বিদেশে এক রুমে অনেককে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। বিদেশের পুলিশ বাংলাদেশ ছাড়া অন্য দেশের নাগরিকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার সাহস দেখায় না। কারণ, ওই সব দেশ প্রতিক্রিয়া দেখায়। যে কোনো দেশেই দূতাবাসের সামনে আমাদের শ্রমিকদের লম্বা লাইন; রোদ বৃষ্টিতে তাঁরা কষ্ট পাচ্ছেন। প্রতারণার ব্যবসাও বেশ চোখে পড়ার মতো। মানুষ নৌপথে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার পথে মিয়ানমারে আটক আছেন। তাঁদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হচ্ছে। অনেকেই তিন মাসের ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে গেছেন। তাঁদের বলে দেওয়া হয়েছে যে মালয়েশিয়া, দুবাই বা সৌদি আরবে যাওয়ার পর ওয়ার্ক পারমিট করতে পারবেন। কিন্তু সরকারের কাছে কোন হিসেব থাকে না যে, কতজন ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছেন, কতজন ফেরত এসেছেন বা কতজন জেলে আছেন। তারা শুধু বিদেশে পাঠাচ্ছে। ফলে অনেকেই বিপদে পড়ছেন। তাঁদের মানবাধিকারের কোনো বিষয় থাকে না।

অভিবাসীগণ সাধারণত যে ধরনের কাজ নিয়ে তাঁরা যান, সেটা পান না। তাঁদের থাকা-খাওয়ার সমস্যা রয়েছে। অনেককে জোর করে দেশে পাঠানো হয়। আবার অনেকে টিকতে না পেরে ফেরত আসেন। অনেক ক্ষেত্রে এজেন্টরা টাকা নিয়ে বিদেশে পাঠায় না, লেবার ভিসার কথা বলে অন্য ভিসা দিচ্ছে। অনেক বেতনের কথা বলে কম বেতন দিচ্ছে। ওভার টাইমের পারিশ্রমিক পাচ্ছে না। বিমানবন্দরে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। অনেক সময় অভিবাসী শ্রমিকের মালিকেরা তাঁদের পাসপোর্ট আটকিয়ে রাখেন। অনেকে ঠিক সময় বেতন পান না। কোভিডের সময় যাঁরা ফেরত এসেছেন, তাঁদের অনেকেই বেতন পাননি।

মানব পাচার ও অবৈধ অভিবাসনের ভয়াবহ প্রভাবে একদিকে যেমন অভিবাসী শ্রমিকদের হুমকিতে ফেলছে। অন্যদিকে হাজারো অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীকে বিপজ্জনক সাগরপথের মধ্য দিয়ে ইউরোপে আশ্রয় লাভে বা অনুপ্রবেশে প্ররোচিত করছে। এতে অনেকের যেমন মৃত্যু হচ্ছে, তেমনি অনেকেরই জেল-জরিমানাও হচ্ছে। এটা মর্মান্তিক। এক্ষেত্রে প্রায়ই প্রস্থান পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে লিবিয়া ও তুরস্কের সমুদ্র উপকূলবর্তী বেলাভূমি। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অসামর্থ্যের কারণে অবনতি হচ্ছে। শরণার্থীদের সুরক্ষায় নিয়োজিত ইউএনএইচআর ও এর সহযোগী এজেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) এ নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থা, বিশেষত জিম্মি দশার কেন্দ্রগুলোয় কোনো সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে অভিবাসীদের প্রবেশ প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। তারা বলেছে, 'সংস্থাটি বৈশ্বিক অভিবাসন বন্ধ করতে চায় না; বরং তারা আন্তর্জাতিক অভিবাসন সুচারুভাবে সামলাতে আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করতে, অভিবাসীদের মানবাধিকার নিশ্চিত, মানব পাচারকারীদের মাধ্যমে অনিয়মিত বিপজ্জনক যাত্রা প্রতিরোধ এবং আইনসম্মত ও বৈধ পথের সুযোগ সৃষ্টি করতে চায়।' তারা 'বিভিন্ন চ্যানেল এবং একটি বহুপক্ষীয় কৌশলের মাধ্যমে বৈশ্বিক অভিবাসনের বিষয়টি সমাধানের' ওপরও দৃষ্টি দিয়েছে। ফলে এটা অবৈধ অভিবাসীদের প্লাবন কিছুটা কমিয়েছে।

বাংলাদেশী নারী শ্রমিকদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। অধিকাংশ নারী দেশে কষ্টকর জীবন কাটাতে কাটাতে বিদেশে কাজ করতে যান। অথচ তাঁদের অনেকেই বিধ্বস্ত স্বপ্ন নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। বিশ্বের ১৬৯টি দেশে প্রায় ১০ লাখ নারী। প্রায় ৭০ হাজার নারী কাজ করছেন সৌদি আরব ও জর্ডানে। এসব দেশে নারী শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে অহরহ। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে ফিরে আসা ব্যক্তিদের ৩৫ শতাংশ নির্যাতনের শিকার এবং ৪৪ শতাংশ নারী বেতন পাননি। অধিকার সচেতনতা ও বেতনে দর-কষাকষির

দক্ষতা না থাকায় ওই সব দেশে ফিলিপাইনের নারীদের তুলনায় আমাদের নারী শ্রমিকদের বেতন কম এবং তাঁরা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন।

২০২১ সালের ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) গবেষণায় এ বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান উঠে এসেছে। ওই গবেষণায় দেখা গেছে, ৩২৩ জনের মধ্যে ৫৫ শতাংশ অভিবাসী নারী শ্রমিক কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন মাত্রায় নির্যাতনের কারণে হয় অপ্রত্যাশিত অথবা বাধ্য হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। এরমধ্যে ২২ দশমিক ৬ শতাংশ নারী কর্মী অভিবাসনের এক বছর শেষ হওয়ার আগেই চলে এসেছেন। অন্যদিকে প্রায় ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ নারী শ্রমিক এক ও দুই বছর এবং ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ দু-তিন বছরের মধ্যে চলে এসেছেন। ফিরে আসা ৩৮ শতাংশই শারীরিকভাবে নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছেন। আবার ৫২ শতাংশই বলপূর্বক শ্রমের শিকার হয়েছেন। অনেকেই ফিরে এসেছেন খালি হাতে ঋণের ভার নিয়ে। বিদেশফেরত নারী কর্মীদের প্রায় ৬১ শতাংশেরই জনপ্রতি ঋণের পরিমাণ ছিল ৭৬ হাজার টাকা। তাদের অধিকাংশই সামাজিক কলঙ্কের পাশাপাশি অর্থনৈতিক দুরবস্থার নতুন চ্যালেঞ্জেরও মুখোমুখি হচ্ছেন।

আমাদের দেশের নারীরা প্রায় কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি ছাড়া বিদেশে যাচ্ছেন। এ জন্য তাঁরা গৃহকর্মীর কাজ ছাড়া আর তেমন কিছু করতে পারেন না। বিদেশে নানা কারণে তাঁরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে বেতন পাচ্ছেন না। আমাদের জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা করতে হবে। দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা শুধু প্রেরণ ও গ্রহণকারী দেশের মধ্যে থাকছে না। জানা যায়, ২০০৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বিদেশে প্রায় ১৫০ জনের বেশি আত্মহত্যা করেছেন। সালমা আলী একটা অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, 'হবিগঞ্জের একটা মেয়ের বয়স ১৪ বছর। তাকে ২৭ বছর বয়স দেখিয়ে তার পাসপোর্ট করা হয়েছে। তারপর তাকে বিএমইটির সব নিয়ম মেনে সৌদি আরব নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে সে নানা নির্যাতনের শিকার হয়ে আইওএমের সহযোগিতায় দেশে ফিরেছে। বিমানবন্দরে আমরা তাকে গ্রহণ করেছি।' আরও অনেক ছোট মেয়ে বিদেশে এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। প্রতিবছর কতজন শ্রমিক মারা যান, কেন মারা যান, ক্ষতিপূরণ আদায়ের সর্বশেষ অবস্থা কী, কর্মীরা বিপদে পড়েছেন কি না, এ সবের বিস্তারিত প্রতিবেদন লেবার উইং থেকে দেওয়ার কথা থাকলেও এ কাজ ঠিকমতো হয় না।

২০০৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৪৭ হাজার ৭২৪টি মৃতদেহ বাংলাদেশে এসেছে। এ ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি দেশ থেকে এসেছে ২৭ হাজার ২৩১ জন। স্ট্রেনদেন্ড অ্যান্ড ইনফরমেটিভ মাইগ্রেশন সিস্টেম (সিমস) এর পক্ষ থেকে নাফিজ ইমতিয়াজ হাসান জানান, গত ১৪ বছরে প্রতিদিন গড়ে ৯টি মৃতদেহ বাংলাদেশে এসেছে। এসব মৃতদেহের দ্বিতীয়বার কোনো তদন্ত হয় না। সরকারের পক্ষ থেকে এর সঠিক তদন্ত দরকার। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সবার দিক থেকে এ ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। স্ট্রেনদেন্ড অ্যান্ড ইনফরমেটিভ মাইগ্রেশন সিস্টেম (সিমস) কর্তৃক জরিপ প্রকল্পের আওতায় নরসিংদী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে ১ হাজার ৩৫৭টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। তার ৯৪ শতাংশ অভিযোগ পুরুষদের কাছ থেকে, ৬ শতাংশ অভিযোগ এসেছে নারীদের কাছ থেকে। এর মধ্যে ২৮ শতাংশ প্রতারণা, ৩৫ শতাংশ চুক্তি না মানা, ২২ শতাংশ মৃত্যু, ভিসা, ইমার্জেন্সি সাপোর্ট ৬ শতাংশ এবং অন্যান্য ৯ শতাংশ। দুর্বল দালিলিক তথ্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রে মামলা ফলপ্রসূ হয় না। তখন আবার তাঁরা মানসিক চাপে ভোগেন। অভিবাসীরা আদালতে মামলা করলেও দীর্ঘসূত্রতার জন্য অনেক সময় তাঁদের হতাশ হতে হয়।

বাংলাদেশে শ্রমিকদের দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে না। মালয়েশিয়া বিমানবন্দরে বাংলাদেশের সুইপার, ভেনিসে কুলি। এমনও অভিবাসী আছেন, যিনি তিনবার সাগর পাড়ি দিয়ে বিদেশে যেতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি চতুর্থবারও যেতে চেয়েছেন। আরেকজন ৮৮ লাখ টাকা খরচ করেও প্রতারিত হয়েছেন। আমাদের কর্মীরা নির্যাতনের শিকার হলে যতটুকু সহায়তা পাওয়ার কথা, সেটা তারা দূতাবাসে বা দেশে ফিরে পাচ্ছে না। অথচ মালয়েশিয়ার এক পুলিশ সদস্য এক ভারতীয় শ্রমিকের পাসপোর্ট ছুড়ে ফেলায় মালয়েশিয়াকে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। আমাদের বিএমইটি, বিমানবন্দর, দূতাবাস, এরা যদি অভিবাসী শ্রমিকদের সম্মান না দেয়, তাহলে বিদেশের মানুষও আমাদের অভিবাসীদের মর্যাদা দেবে না।

প্রবাসী কল্যাণে আমাদের করণীয়

প্রবাসীরা প্রায় সময় নানাভাবে বঞ্চনা, শোষণ, অবহেলা ও নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। কখনও কখনও নির্যাতিত হচ্ছেন আবার অনেকেই ন্যায়বিচার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। কোনো কোনো দেশের কারাগারে বাংলাদেশীরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছেন। বিদেশে শ্রমিক প্রেরণের ক্ষেত্রে শ্রমিকরা যাতে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হয় সেজন্য সরকারের দেশ-বিদেশে তদারকি ব্যবস্থাও জোরদার করা আবশ্যক।

অভিবাসনের ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুলিশ বিভাগের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ভূমিকা রয়েছে। কোনো একটা সমস্যা হলে এক মন্ত্রণালয় আরেক মন্ত্রণালয়ের ওপর দায় চাপায়। আবার প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট কম। একইভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়েরও বাজেট কম। অভিবাসী শ্রমিকের সুরক্ষা, ন্যায়বিচার ও নিরাপদ অভিবাসন নিয়ে নির্বাচনী দলগুলোর ম্যানিফেস্টোতে থাকতে হবে। প্রবাসীকল্যাণ, পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত সমন্বয় মিটিং করা উচিত। এসব মন্ত্রণালয় বিদেশে কর্মরত কর্মীদের জন্য সে দেশের দূতাবাস কী করছে, সেটা খোঁজ নিতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের দিকনির্দেশনা দিতে পারে, দায়বদ্ধ করতে পারে। অভিবাসনের ক্ষেত্রে সুশাসন ও মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রবাসী দেশের জবাবদিহির জায়গা নেই। প্রবাসী দেশের আইনি প্রয়োগ কার্যকর করতে হবে। আমাদের দ্বিপক্ষীয় চুক্তি নেই। আছে সমঝোতা স্মারক। একজন ক্ষতিগ্রস্ত অভিবাসীকে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তা কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়। বিদেশে কোন কর্মী মারা গেলে সে দেশের সরকার, বাংলাদেশ দূতাবাস ও বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে।

বিদেশি শ্রমিকের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ শ্রমিক যাচ্ছেন সৌদি আরবে। তাহলে অন্তত এই দেশের সমস্যা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা দরকার। কর্মীদের আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য সরকার সৌদি আরবের কিছু শহরে আইনি ফার্মের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে। ২০২০ সালে রিক্রুটিং এজেন্সির মান নির্ধারণের জন্য একটা বিধি হয়েছে। এই বিধি মোতাবেক রিক্রুটিং এজেন্সির মান নির্ধারণ করা হচ্ছে না। এসব বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

বিদেশে কর্মীদের নিজের অর্থ খরচ করেই আইনি সহায়তা নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশী দূতাবাস অভিবাসীদের আইনি সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ নিতে পারে। অভিবাসীদের সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য আলাদা ট্রাইব্যুনালের বিষয়টি সরকারকে ভাবতে হবে। বিদেশের মাটিতে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য আইএলও কনভেনশনের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে আইনি সুরক্ষা পাওয়ার জন্য স্থানীয় ল ফার্মগুলোর সঙ্গে চুক্তি করতে হবে। বিদেশে নারীদের হেল্পডেস্ক বাড়াতে হবে। শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সচেতন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মজুরির পাশাপাশি শ্রমিকের মর্যাদার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্ব শ্রমবাজারে আজ আমাদের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত, চীন, নেপাল, ফিলিপাইন এবং শ্রীলঙ্কা। তুলনামূলক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এসব দেশের শ্রমিকরা আমাদের দেশের তুলনায় বেশি দক্ষ। বিশ্ব শ্রমবাজারে আমাদের পাল্লা দিতে হলে অবশ্যই দক্ষ শ্রমিক তৈরি ও নিয়োগে সবচেয়ে বেশি মনোযোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথ সরকারি উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের এক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু ও সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন নিয়ে এগোতে হবে। বাংলাদেশের বিদেশগামী শ্রমিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে বিদেশে পাঠানো হলে তারা আরও ভালো বেতনে চাকরি লাভের সুযোগ পাবেন। দেশও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হবে। এ ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্টদের মুনাফা বাণিজ্য কমাতে হবে। বিদেশে নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করণে আরো সতর্ক হতে হবে। যিনি কাজে যাচ্ছেন, তাঁরও ওই দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, কাজের ধরন, উপযোগী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। কারিগরি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। আমাদের ১৫০টির মতো বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কয়েক শ পলিটেকনিক আছে। বিদেশ থেকে যাঁরা ফেরত আসছেন, তাঁরাসহ সবাই মিলে পরিকল্পনা করলে ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়া কোনো বিষয় নয়। কিন্তু সরকার ইটপাথরের বাইরে কোনো চিন্তা করছে না। রাষ্ট্র দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুশাসন দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

জাতীয় সংসদে নিরাপদ অভিবাসন নিয়ে জোরালো আলোচনা করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে অভিবাসী শ্রমিকের প্রবাসে মৃত্যুর কারণ তদন্ত অত্যন্ত জরুরি। অভিবাসনের ক্ষেত্রে সুশাসন, মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। মজুরির পাশাপাশি শ্রমিকের মর্যাদা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সচেতন করতে হবে। নিরাপদ অভিবাসনের জন্য ফলপ্রসূ তদারক জরুরি। অভিবাসীদের সুবিচার নিশ্চিত করতে সরকারের আলাদা ট্রাইব্যুনাল করা উচিত। অভিবাসনসংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় বিদেশে বাংলাদেশী দূতাবাসের কর্মকর্তাদের আরও কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে।

বিদেশে বাংলাদেশী মিশনগুলো নিয়মিত সেখানে থেকে বাংলাদেশীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। তাঁদের সমস্যা জেনে সমাধানে কাজ করবেন। যেসব দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস নেই, সেখানে থাকা কর্মীদের জন্য বিকল্প সেবা ও টাকা পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দেশে ফেরা প্রবাসী কর্মীরা যাতে বিমানবন্দরে কোনো ধরনের হয়রানির শিকার না হন, সেদিকটি নিশ্চিত করতে হবে। তাঁদের লাগেজ চুরি বা প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে সব হারানোর ঘটনা কম নয়। তাই তাঁদের জন্য সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিতেই হবে। একই সঙ্গে রেমিট্যান্স পাঠানোর ভিত্তিতে তাঁদের বিশেষ সুযোগ বা সম্মান দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। দেশে এলে তাঁদের জন্য বিমানবন্দরে বিশেষ ছাড় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা দিলে তাঁদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে বলে আশা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স-প্রবাহে কিছুটা ভাটা পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বরে প্রবাসীরা মোট ১৭৩ কোটি ডলার অর্থ দেশে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আগের অর্থবছরে একই মাসে এসেছিল ২১৫ কোটি ডলার। অর্থাৎ গত সেপ্টেম্বর মাসে রেমিট্যান্স কমেছে ৪২ কোটি ৪৮ লাখ ডলার বা ১৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স বিগত ১৬ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থায় রয়েছে। এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কূটনীতিতে বিশেষ জোর দিতে হবে। দক্ষতা বাড়াতে হবে। দক্ষতা উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করা গেলে বিদেশে আমাদের কর্মীদের জন্য বাড়তি কর্মসংস্থান তৈরি হবে। এক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি অর্জন করতে পারলে ইউরোপ, যুক্তরাজ্য, উত্তর আমেরিকাসহ এশিয়ার অন্য উন্নত দেশগুলোয়ও বাংলাদেশী নাগরিকদের চাহিদা বাড়বে বৈকি। বিদেশে শ্রমিক প্রেরণের ক্ষেত্রে শ্রমিকরা যাতে হয়রানি ও প্রতারণার শিকার না হয় সেজন্য সরকারের দেশ-বিদেশে তদারকি ব্যবস্থাও জোরদার করা আবশ্যক। টেকসই উন্নয়ন এবং দরিদ্রতা কমাতে হলে বৈশ্বিক অভিবাসন বাজারে অব্যাহতভাবে জনসম্পদ পাঠানো এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে দেশ-বিদেশে সরকারি মনিটরিং প্রয়োজন। দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি বৈদেশিক রেমিট্যান্স। এর গুরুত্বকে অনুধাবন করে জনশক্তি রপ্তানি খাতকে সরকারিভাবে বিশেষ অগ্রাধিকার দিতে হবে। জনসংখ্যার সমস্যাকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তর করতে হবে। এক্ষেত্রে বিদেশ-গমনেচ্ছুদের জন্য প্রত্যেক জেলাতে একটি করে বিশেষায়িত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা এবং প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের বিদেশ গমনের জন্য সহজশর্তে সরকারিভাবে ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে টাকার সমস্যা দূরীকরণে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি- বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক; প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রমিক অসন্তোষ: রাজনৈতিক দলগুলোর দুঃখজনক নিষ্ক্রিয়তা

আলী আহমাদ মাবরুর

বাংলাদেশের বাস্তবতায় শ্রমিক অসন্তোষ বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের অসন্তোষ নতুন কোনো বিষয় নয়। তবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যখন আসন্ন, এমতাবস্থায় এ ধরনের একটি আন্দোলনের তৎপর্য অনেকটাই ভিন্নরকম এবং আরও বেশি ভিন্ন হতেও পারতো। দেশের সম্ভাবনাময় তৈরি পোশাক শিল্পখাতে চলমান শ্রমিক অসন্তোষের মূলে কাজ করছে নতুন মজুরি কাঠামো। আগের চেয়ে ৫১ শতাংশ মজুরি বাড়িয়ে করা নতুন কাঠামো কোনোভাবেই মানতে চান না শ্রমিকরা। আবার বাহ্যিক দৃষ্টিতে মেনে নিলেও নতুন কাঠামো নিয়ে আপত্তি রয়েছে মালিক পক্ষেরও। দেশজুড়ে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই তীব্র হয়ে উঠেছে শ্রমিক অসন্তোষ।

সম্প্রতি পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশের গুলিতে দুই শ্রমিক নিহতের পর থেকেই বাড়তে থাকে অসন্তোষ। অন্যদিকে ন্যূনতম মজুরির দাবি আদায় না হওয়াতেও দিনে দিনে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন শ্রমিকরা। যা ধীরে ধীরে ঢাকার মিরপুর, আশকোনা, আশুলিয়াসহ গাজীপুরের বিভিন্ন স্থানসহ দেশের আরও কিছু জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণে ৭ নভেম্বর পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে সরকার। এতেও শ্রমিকদের দাবি পূরণ হয়নি। সরকার নির্ধারিত ১২ হাজার ৫০০ টাকা ন্যূনতম মজুরির সিদ্ধান্ত তারা প্রত্যাখ্যান করেন। আর এ কারণেই ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার পরও দাবি আদায়ের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আন্দোলন চালু রয়েছে। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ৮ নভেম্বর গাজীপুরে বিক্ষোভে নামেন বেশ কয়েকটি গার্মেন্টের শ্রমিকরা। এতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথেও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তারা। এ সময় পুলিশের গুলিতে আঞ্জুয়ারা খাতুন (৩০) নামের এক নারী শ্রমিক নিহত হন। দুপুরের এ ঘটনার পর শেষ বিকালে ফের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশের এক সদস্যের হাতের কব্জি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনাও ঘটে।

পরিস্থিতির একপর্যায়ে গার্মেন্ট মালিকদের পক্ষ থেকেও বলা হয়, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের পরও শ্রমিকদের আন্দোলন দুঃখজনক। দাবি আদায়ে শ্রমিকদের আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাধা, মালিকপক্ষের অনমনীয়তা, সবমিলিয়ে চরম পর্যায়ে যাচ্ছে পোশাক শ্রমিকদের মধ্যে বিদ্যমান অসন্তোষ। সমাবেশেরও ডাক দিচ্ছেন শ্রমিকরা। যা মোকাবিলা সরকারের জন্য অনেকটাই চ্যালেঞ্জিং হতে পারে বলেও ধারণা করছেন সংশ্লিষ্টরা। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য গাজীপুরের বিভিন্ন ফ্যাক্টরি এরই মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এবারের শ্রমিক বিক্ষোভ দমনে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী রয়েছে জবরদস্তিমূলক কৌশলে। বিভিন্ন পত্রিকার অনুসন্ধানী রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ঘোষিত মজুরি কাঠামো নিয়ে শ্রমিকদের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভ থাকলেও শ্রমিক সংগঠনগুলোর সাথে সরকারের সমঝোতার ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনের আগে তারা কোনো জোরদার আন্দোলনে যায়নি। জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় তখন পোশাক কারখানা এবং শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলোর ওপর কড়া নজরদারি আরোপ করে সরকার। গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য ছিল, নতুন মজুরি কাঠামোর বাস্তবায়ন নিয়ে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। জাতীয় নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে কোনো ধরনের শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হলে সেটি জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে বলেও আশঙ্কা ছিল গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর। শিল্প পুলিশের পাশাপাশি শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় নজরদারি বাড়ায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।

এরই মধ্যে র‌্যাব জানিয়েছে, শ্রমিক অসন্তোষ থেকে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কোনো রাজনৈতিক দলের নাম উল্লেখ না করে র‌্যাব-১ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মোসতাক আহমেদ মিডিয়াকে বলেছেন, "শান্তিপ্রিয় শ্রমিকরা রাস্তাঘাট অবরোধ, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর করতে পারে বলে আমাদের মনে হয় না। আমরা বিশ্বাস করি, এর সঙ্গে অন্য শক্তি জড়িত। এটাতে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।" কর্নেল মোসতাক আরও বলেন, "এরই মধ্যে শ্রমিকদের বেতন বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু কিছু কুচক্রীমহল শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে পরিস্থিতি খারাপ করার চেষ্টা করছে। এজন্য ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পরিবেশ শান্ত রাখতে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি র‌্যাব সদস্যরাও কাজ করছেন। কিছু অসাধু বা কুচক্রীমহল কারখানা ভাঙচুর ও পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করছে। "গার্মেন্ট শিল্প আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা যাতে কেউ অশান্ত করতে না পারে তার জন্য র‌্যাব-১ ও বিজিবি একসঙ্গে কাজ করছে। আমরা শ্রমিকদের কাজে ফেরানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছি।"

অন্যদিকে, শিল্প পুলিশের ডিআইজি মো. জাকির হোসেন খান বলেছেন, "গার্মেন্টস সেক্টরে শ্রমিকের মজুরি বাড়ানোকে কেন্দ্র করে গাজীপুরে শ্রমিক অসন্তোষ চলছে। আমাদের কাছে তথ্য আছে ১২৩টি কারখানায় কমবেশি ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালানো হয়েছে। বিভিন্ন থানায় ২২টি মামলায় এ পর্যন্ত ৮৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শ্রমিকদের আন্দোলন কোনাবাড়িতে বেশি। আশুলিয়াতে কিছুটা আছে বা চট্টগ্রাম এলাকায় আন্দোলন নেই। কোনাবাড়িতে একটি গ্রুপ এখানে মদদ দিচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও ইন্টিলিজেন্টস সেল আছে তারাও কাজ করছে।"

এ পর্যন্ত আলোচনায় এটি পরিষ্কার যে, চলমান শ্রমিক আন্দোলনের ভেতর একটি রাজনৈতিক ফ্লেভার আছে এবং সরকারি দল ও রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে এরকম একটি আন্দোলনের তথ্য আগে থেকেই ছিল। এবার চলমান আন্দোলনের যৌক্তিকতা একটু নিরুপণ করা যাক। পরবর্তী অংশে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকার ওপরও আলোকপাত করা হবে।

মজুরি সংক্রান্ত রেকর্ড থেকে জানা যায়, তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি সর্বপ্রথম নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। এটি পোশাক শিল্পবিষয়ক প্রথম মজুরি বোর্ড। এ বোর্ড ঘোষিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ছিল ৬২৭ টাকা। পোশাক শ্রমিকদের জন্য দ্বিতীয় মজুরি বোর্ড গঠিত হয় নির্ধারিত পাঁচ বছরের পরিবর্তে ৯ বছর পর, ১৯৯৪ সালে। দ্বিতীয় মজুরি বোর্ড ঘোষিত নিম্নতম মজুরি ছিল ৯৩০ টাকা, যা প্রথম মজুরি বোর্ডের ঘোষিত মজুরির ৪৮ শতাংশের অধিক। পোশাক শ্রমিকদের জন্য তৃতীয় মজুরি বোর্ড গঠিত হয় নির্ধারিত পাঁচ বছরের পরিবর্তে ১২ বছর পর, ২০০৬ সালে। তৃতীয় মজুরি বোর্ড ঘোষিত নিম্নতম মজুরি ছিল ১৬৬২.৫০ টাকা, যা দ্বিতীয় মজুরি বোর্ডের ঘোষিত মজুরির চেয়ে ৭৮ শতাংশের অধিক। চতুর্থ মজুরি বোর্ডটি নির্ধারিত পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে চার বছরের মাথায় ২০১০ সালে গঠিত হয়।

চতুর্থ মজুরি বোর্ড ঘোষিত সর্বনিম্ন মজুরি ছিল ৩০০০ টাকা যা তৃতীয় মজুরি বোর্ডের ঘোষিত মজুরির ৮০ শতাংশের অধিক। চতুর্থ মজুরি বোর্ডের মতো পঞ্চম মজুরি বোর্ডটিও পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগে তিন বছরের মাথায় ২০১৩ সালে গঠিত হয়েছে। পঞ্চম মজুরি বোর্ড ঘোষিত নিম্নতম মজুরি ছিল ৫৩০০ টাকা, যা চতুর্থ মজুরি বোর্ডের ঘোষিত মজুরির তুলনায় ৭৬ শতাংশের বেশি। আর এবার গঠিত ষষ্ঠ মজুরি বোর্ড আগেও মজুরি ৫১ শতাংশ বাড়িয়ে ৮ হাজার টাকা নির্ধারণ করে।

কভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিশ্বজুড়ে এই মুহূর্তে একাধিক যুদ্ধ চলমান থাকায় দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় যেভাবে বেড়েছে সেই বিচারে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি মোটেও যৌক্তিক হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই তাই পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা হওয়ার পরও সাভারের আশুলিয়ায় শ্রমিকদের ভেতর অসন্তোষ দেখা গেছে। কারখানায় প্রবেশ করে কাজ না করেই ফিরে যাচ্ছেন তারা। সকাল থেকে কয়েকটি কারখানায় শ্রমিকরা প্রবেশ করলেও তারা কাজে যোগ দেননি। শ্রমিকরা কারখানায় প্রবেশ করে কাজ না করে নিজ থেকে বেরিয়ে যান। আবার কিছু কারখানায় শ্রমিকরা কাজ শুরু করলেও আশেপাশের কারখানা ছুটি দিয়ে দেওয়ায় বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় তাদের কারখানায়ও ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাদের অধিকাংশই নতুন মজুরিতে সন্তুষ্ট নন, মজুরি সাড়ে ১২ হাজার হলে কম হয়ে যায়। এতে আমরা খুশি নই। যদি একজন হয়, তাহলে হয়তো চলতে পারবে। তা না হলে বাসা ভাড়া, গ্যাস বিল ও অন্যান্য খরচ দিয়ে এই মজুরিতে চলা যায় না। মজুরি খুব বেড়েছে বলে মনে হয় না। চারজনের একটি পরিবার কোনোভাবেই বর্তমান বাজারে সাড়ে ১২ হাজার টাকা দিয়ে চলতে পারবে না। মজুরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রকারান্তরে মালিকপক্ষকে খুশি করারই প্রস্তাব।

বর্তমান মজুরির তুলনায় নিম্নতম মজুরি বাড়ছে মাত্র ৫৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। অথচ ২০১৩ সালেই পোশাক খাতের নিম্নতম মজুরি ৭৬ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল। যেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি গত ১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং গত ৪৬ বছরের মধ্যে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার সবচেয়ে বড়ো দরপতন হয়েছে, সেখানে ৫ বছরের আগের মজুরির চেয়ে মাত্র ৫৬ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি কোনোভোবেই পোশাক শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাবে না। অন্যান্য দেশের মজুরির পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের বয়স চার দশকের বেশি সময় হলেও প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় এ খাতের শ্রমিকদের মজুরি সবচেয়ে কম। পোশাক শ্রমিকদের জন্য সর্বশেষ মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০১৮ সালে। সে সময় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮ হাজার টাকা। ডলারের বিনিময় হার বিবেচনায় সে সময় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল ৯৫ ডলার ৩৫ সেন্ট।

বর্তমানে সরকার নির্ধারিত ডলারের দাম বিবেচনায় নিলে মজুরি দাঁড়ায় ১১৩ ডলারের মতো।

চীনের পর বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। চীনে এ শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩০৩ ডলার। রপ্তানিতে বাংলাদেশের পরে আছে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত। গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সিপিডির দেওয়া তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ভিয়েতনাম, ভারত, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়ার ন্যূনতম মজুরি যথাক্রমে ১৭০ ডলার, ১৭১ ডলার, ২০০ ডলার ও ২৪৩ ডলার। এ দেশগুলোর সঙ্গে বিশ্বের একই বাজারে বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতা করতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব দেশের পোশাক কারখানার মালিকেরা পারলে বাংলাদেশের মালিকেরা কেন পারেন না?

কয়েক দশক ধরে বিশ্বে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের ব্র্যান্ডিং হলো সস্তা শ্রমের শ্রমিক। কিন্তু সেটা কতটা পর্যন্ত সস্তা হতে পারে? কত দিন পর্যন্ত সস্তা থাকতে পারে? কারখানার উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে হলে শ্রমিকদের খেয়ে-পরে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হবে। যে জায়গায় তাঁরা থাকছেন, সেই বাসস্থানটা স্বাস্থ্যকর হতে হবে। কিন্তু যে মজুরিটা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তাতে একজন শ্রমিকের পক্ষে তাঁর পরিবার নিয়ে ভালোভাবে টিকে থাকা কতটা সম্ভব?

ব্যবসা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি পোশাকশিল্প সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনা পাওয়ার দিক থেকেও সবচেয়ে এগিয়ে। অন্যান্য শিল্পকারখানাকে যেখানে ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত করপোরেট কর দিতে হয়, সেখানে পোশাক কারখানার জন্য এই করের হার ১০-১২ শতাংশ। এ ছাড়া নগদ সহায়তা, মূসক অব্যাহতি, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নেওয়া ও শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানির সুবিধা পান পোশাকশিল্পের মালিকেরা। এতটা সুবিধা পাওয়ার পরও প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ায় এতটা পিছিয়ে থাকা কোনোভাবেই যৌক্তিক হতে পারে না।

আমাদের রাজনীতির বড়ো সংকট হলো, শ্রমিকদের দাবিগুলো এতটা ন্যায্য ও যৌক্তি হওয়ার পরও এই ইস্যুটি জাতীয় রাজনীতির একটি অংশ হয়ে উঠতে পারেনি। সরকারি দল যেহেতু ক্ষমতায় আছে এবং সামনেই জাতীয় নির্বাচন-তাই তারা যেনতেনভাবে শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও মালিক পক্ষকে আস্থায় নিয়ে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবে–এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যারা বিরোধী দলে আছেন, যারা সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আন্দোলনে সক্রিয় রয়েছেন, তারা এই শ্রমিক অসন্তোষ এবং চলমান আন্দোলনকে নিজেদের আস্থায় নিতে পারলেন না– যা নিতান্তই দুঃখজনক।

জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল এই বিষয়ে সরব হয়নি। সংসদের বাইরে প্রধান যে বিরোধী দল তারা এই ইস্যুকে লুফে নিতে পারেনি। অন্যান্য বিরোধী দলগুলো একটি বিবৃতি দিয়ে দায় সাড়ার চেষ্টা করলেও শুধুমাত্র শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ে পৃথক কোনো অবস্থান নিতে পারেনি। শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করেনি। শ্রমিক সংগঠনগুলোর সাথে বসে চলমান বিরোধী দলের আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের মাঝে সমন্বয় করতে পারেনি। সাভারে একজন শ্রমিক এবং গাজীপুরে নারী শ্রমিক হত্যার পরও সমবেদনা জানানোর ক্ষেত্রে তারা কৃপণতা করেছেন। নিহত শ্রমিকদের পরিবারগুলোর পাশে গিয়ে তারা দাঁড়াতে পারেননি। চলমান অবরোধ যে রাজনৈতিক দাবিগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে সেখানে শ্রমিকদের যৌক্তিক মজুরি দেওয়ার দাবিটাও তারা সংযোজন করতে পারেননি।

রাজনীতি নিয়ে অনলাইনে অজস্র বিশ্লেষণ ও নানামুখী তৎপরতা চোখে পড়লেও শ্রমিক অসন্তোষের বিষয়টি হাইলাইট হয়নি। বরং এভাবে বলা যায়, চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শ্রমিকদের আন্দোলন ও আত্মত্যাগের বিষয়টি উল্টো চাপা পড়ে গেছে। এতে করে আবারও বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতি আসলে মানুষকে কেন্দ্র করে হয় না। যে পরিমাণ আগ্রহ ও তৎপরতা পরাশক্তিসহ নানা মহলের সমর্থন আদায়ের জন্য পরিচালিত হয় সেই তুলনায় শ্রমিক ও মজলুম মানুষগুলোর সমর্থন পাওয়ার জন্য খুব কম চেষ্টাই করা হয়। মানুষের জন্য রাজনীতি করার দাবি যারা করেন তাদের এই নিষ্ক্রিয়তা কার্যত তাদের নৈতিক অবস্থানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। শ্রমিকদের আন্দোলনকে জাতীয় ইস্যুতে পরিণত করার সুযোগ বিরোধী দলগুলো হাতছাড়া করলো বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

অনেকেই মনে করেন, সরকারি দল বিভিন্ন স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার ফায়দা নিচ্ছে। কথাটি হয়তো সত্য। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিরোধী দলগুলোও এরকম সুযোগ নিতে পারতো। কিন্তু সুযোগ নেওয়ার জন্য যে উদার মানসিকতা, দূরদর্শিতার প্রয়োজন ছিল সেক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি থাকার বিষয়টি এবার আবারও স্পষ্ট হয়েছে। বিরোধী দলের চূড়ান্ত আন্দোলনের এই সময়ে পোশাকশিল্প সেক্টরে উত্তেজনা বিরোধী আন্দোলনের জন্য শাপেবর হতে পারতো। কিন্তু বিরোধীরা তা পকেটে নিতে পারিনি, ক্যাশও করতে পারিনি।

গার্মেন্টস শ্রমিক আনজুয়ারার মৃত্যু নিয়ে আমরা কেউ সরব হইনি। তার স্বামী জামাল যখন আকুতি করে বলছিলেন, "তার স্ত্রী ফ্যাক্টরি থেকে বের হয়ে বাসায় ফিরতে চেয়েছিল কিন্তু সে রাস্তা চিনতে পারেনি। এ গলি সেই গলি ঘুড়ে বেড়িয়েছে আর তখনই পুলিশের একটি গুলি এসে তার শরীরে বিদ্ধ হয় যার ফলে সে মারা যায়।" তার স্বামী ও পরিজনদের সেই কান্না আর আহাজারিও আমাদেরকে রাজনীতিকে জনবান্ধব বিশেষ করে শ্রমিক বান্ধব করে তুলতে পারেনি। মূলধারার রাজনীতিবীদদের এই নিষ্ক্রিয়তার কারণে একটি সময়ে মনে অসন্তোষ পুষে রেখে কিছু লাশের বিনিময়ে শ্রমিক ভাই ও বোনেরা হয়তো ১২৫০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি বাধ্য হয়েই মেনে নিবেন, তবে জাতীয় রাজনীতিতে শ্রমিকদের এই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার বিষয়টি সামগ্রিকভাবে রাজনীতিকেই দুর্বল করে দিবে।

লেখক: সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

ট্রেড ইউনিয়নের রিটার্ন দাখিল ও নির্বাচন

কবির আহমদ

ঐক্যই শক্তি, সংগঠিত মানুষই শক্তিশালী মানুষ এই স্লোগানের ভিত্তিতেই ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়।

ট্রেড ইউনিয়নের সংজ্ঞা: শ্রমিক কর্মচারীর সঙ্গে মালিক বা ব্যবস্থাপক কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ও বৈধ করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক কর্মচারী অথবা মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দ্বারা গঠিত সংঘ বা সংস্থাকে ট্রেড ইউনিয়ন বলে।

ট্রেড ইউনিয়ন ৪ প্রকার: ১. বেসিক ইউনিয়ন: (ক) প্রাতিষ্ঠানিক (খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক /প্রাতিষ্ঠানিক পুঞ্জ ।

২. পেশাভিত্তিক ফেডারেশন/ ক্র্যাফট ফেডারেশন। একই প্রকারের শিল্পে বা পেশার কমপক্ষে ৫টি বেসিক ইউনিয়ন মিলে পেশা ভিত্তিক ফেডারেশন গঠিত হয়।

৩. জাতীয় ফেডারেশন। বিভিন্ন পেশার ২০ বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে জাতীয় ফেডারেশন বলা হয়।

৪. কনফেডারেশন। ১০টি জাতীয় ফেডারেশন নিয়ে কনফেডারেশন গঠিত হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন: শিল্প বিকাশের গোড়ার দিকে যখন মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল তখন এই দুপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপনের জন্য কোনো সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু আধুনিক যুগে কলকারখানা/শিল্প ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত যোগাযোগের বিষয়টি অনুপস্থিত এবং মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কটি টানাপোড়নে সংকটপূর্ণ। শ্রম শক্তির ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যকার স্বার্থে দ্বন্দ্ব ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে। ১৮৯০ সালে ভারতে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত হয়। বোম্বে মিল হ্যান্ডস। ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করার সাথে সাথে আপনি আইনের আওতায় চলে আসলেন। যথাযথ ভাবে তালিকাসহ যাবতীয় কাগজপত্র জমা দিবেন। ট্রেড ইউনিয়নের জন্য একটি বড়ো কাজ হলো গঠনতন্ত্র তৈরি করা। এই গঠনতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনার জন্য একটি আইন ও পদ্ধতি।

রিটার্ন দাখিল:

১. শ্রম আইন ২০০৬ এর ২০১ নং ধারা অনুযায়ী বিধি ১৭৬ (১) এর অধীনে ইংরেজি বছর শেষ হওয়ার পর পরবর্তী বছরের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে উক্ত বছর সংক্রান্ত ট্রেড ইউনিয়নের আয়-ব্যয় এবং সম্পদ ও দায়ের হিসাব সম্বলিত একটি সাধারণ বিবরণী বিধি ৬১ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রস্তুত ও নিরীক্ষণ করে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষর দিয়ে শ্রম পরিচালকের নিকট প্রেরণ করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নে পাঁচশত সদস্য হলে নিরীক্ষণ করতে হবে এবং কম সংখ্যক সদস্য হলে নিরীক্ষণ করতে হবে না। বেসিক ইউনিয়ন ১ বছর অন্তর, দেশ ভিত্তিক ইউনিয়ন ও ফেডারেশন ২ বছর অন্তর রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

২. যে বছরের রিটার্ন দাখিল করা হবে, সেই বছরের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের সকল পরিবর্তন প্রদর্শন করে

একটি বিবরণী ও গঠনতন্ত্রের ১টি কপি শ্রম পরিচালকের নিকট প্রেরণ করতে হবে। পুরাতন ও নতুন কার্যকরী কমিটির তালিকা শ্রম অধিদপ্তরে পেশ করতে হবে।

৩. ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের তালিকা ও চাঁদা আদায়ের তালিকা প্রেরণ করতে হবে।

৪. ট্রেড ইউনিয়নটি কোন ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত তা রিটার্নে উল্লেখ থাকতে হবে।

৫. যদি কোন ট্রেড ইউনিয়ন উপধারা (১) এ উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে শ্রম পরিচালক নোটিশ দ্বারা উক্ত ট্রেড ইউনিয়নকে অবহিত করবে। উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে যদি ট্রেড ইউনিয়নটি রিটার্ন দাখিল করিতে পুনরায় ব্যর্থ হয় তা হলে উক্ত ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের জন্য শ্রম আদালতে মামলা করতে পারবে।

৬. রেজিস্ট্রেশন আবেদন ও বার্ষিক রিটার্ন দাখিল অনলাইনে করা যাবে। তবে এই ক্ষেত্রে সকল কার্যক্রমের একটি প্রিন্ট কপি সংরক্ষণ করতে হবে।

রিটার্ন দাখিলে যা প্রয়োজন:

১. ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা সন ও তারিখ, রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং সদস্য সংখ্যা

২. সভা সমূহের কার্যবিবরণী

৩. আয়-ব্যয়ের হিসাব ও সম্পদ বিবরণী

রিটার্ন দাখিলের সময় নিম্নোক্ত ফরমগুলি পূরণ করতে হবে:

ফরম-৬১ (ক)

[ধারা ২০১ এবং বিধি ১৭৬(১)দ্রষ্টব্য]

ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক দেওয়া সাধারণ বিবরণী (বার্ষিক রিটার্ন)

(বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ২০১ এবং বিধি ১৭৬ (১) এর অধীন ২০.. সনের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় বার্ষিক বিবরণী)

ট্রেড ইউনিয়নের নাম:..

রেজিস্ট্রেশন নং:......................... তারিখ:.......................ঠিকানা: ....

বৎসরের শুরুতে ইউনিয়নের চাঁদা প্রদানকারী সদস্য সংখ্যা			বৎসরের মধ্যে নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি			বৎসরের মধ্যে ইউনিয়ন ত্যাগকারী সদস্যের সংখ্যা			বৎসরের শেষে ইউনিয়নভুক্ত সদস্য সংখ্যা		
পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট

১। বৎসরের শুরুতে রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত সদস্য সংখ্যা।

২। বৎসরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি।

৩। বৎসরের মধ্যে যেসব সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন ত্যাগ করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা।

৪। বৎসরের শেষে রেকর্ডেও অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের সংখ্যা।

৫। কোন ফেডারেশনের সহিত অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিলে সেই ফেডারেশনের নাম (অদ্যাবধি সংশোধিত গঠনতন্ত্রের একটি কপি এতদসঙ্গে সংযোজিত)

৬। বৎসরের হিসাব অনুমোদন সংক্রান্ত সাধারণ/বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের কপি।

....

সভাপতির স্বাক্ষর ও নামসহ সীল — সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল

ফরম-৬১ (খ)

[ধারা ২০১ এবং বিধি ১৭৬(১)দ্রষ্টব্য]

ফেডারেশন কর্তৃক দেওয়া বার্ষিক সাধারণ বিবরণী (বার্ষিক রিটার্ন)

(বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ২০১ এবং বিধি ১৭৬ (১) এর অধীন ২০... সনের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় বার্ষিক বিবরণী)

ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নাম:...

প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা:...

রেজিস্ট্রেশন নং:.........................

তারিখ:.......................

ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ফেডারেশন কর্তৃক দেওয়া বিবরণী

বৎসরের শুরুতে অধিভুক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা			বৎসরের মধ্যে ফেডারেশনে যোগদানকারী ইউনিয়নের সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা			বৎসরের মধ্যে ফেডারেশন ত্যাগকারী ইউনিয়ন সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা			বৎসরের শেষে ফেডারেশনর্ভুক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট		পুরুষ	মহিলা	মোট		পুরুষ	মহিলা	মোট		পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

১। বৎসরের শুরুতে অধিভুক্ত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সংখ্যা এবং উহার প্রত্যেকের সদস্য সংখ্যা।

২। বৎসরের মধ্যে যোগদানকারী ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সংখ্যা এবং উহার প্রত্যেকের সদস্য সংখ্যা।

৩। বৎসরের মধ্যে ত্যাগ করিয়া যাওয়া ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা।

৪। বৎসরের শেষে অধিভুক্ত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সংখ্যা এবং উহার প্রত্যেকের সদস্য সংখ্যা।

৫। বৎসরের হিসাব অনুমোদন সংক্রান্ত সাধারণ বা বিশেষ সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের কপি।

....

সভাপতির স্বাক্ষর ও নামসহ সীল — সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল

ফরম-৬১ (ঘ)
[ধারা ২০১ বিধি ১৭৬ (১) দ্রষ্টব্য]
তহবিলের হিসাব বিবরণী (প্রথম অংশ)

আয়	পরিমাণ	পরিমাণ	পরিমাণ
.... বৎসরের শুরুতে জের	টাকা	কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও খরচ	
সদস্যদের নিকট হইতে চাঁদা		নিরীক্ষকের ফি	
সদস্যদের নিকট হইতে বিশেষ চাঁদা.		আইনগত খরচ	
দান/অনুদান		শিল্প বিরোধ পরিচালনার জন্য-ব্যয়	
বিভিন্ন প্রকাশনা ও গঠনতন্ত্র বিক্রয়		শিল্প বিরোধজনিত কারণে সদস্যদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ..	
বিনিয়োগের উপর সুদ/মুনাফা		সদস্যদেরকে প্রদত্ত ঋণ	
বিভিন্ন উৎস হইতে আয় (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে)		মৃতদেহ সৎকার, বার্ধক্য, চিকিৎসা বা অন্যান্য কল্যাণ সুবিধা ..	
		প্রকাশনার খরচ .. .. .. পত্রিকা/সাময়িকী খরচ	
		ভাড়া, কর, খাজনা	
		ইউটিলিটি (গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, ফোন) চার্জ..	
		আসবাবপত্র ক্রয় .. .. আসবাবপত্র মেরামত	
		যন্ত্রপাতি ক্রয় .. .. যন্ত্রপাতি মেরামত	
		মনোহারী .. .. ছাপা	
		ডাকমাশুল	
		ফেডারেশনে প্রদেয় চাঁদা	
		অন্যান্য খরচ (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে)	
		বার্ষিক সাধারণ সভায় খরচ এবং অন্যান্য আপ্যায়ন খরচ	
		যাতায়াত খরচ	
		জাতীয় দিবস উদযাপন খরচ .. .. .. বিবিধ খরচ	
মোট		মোট	
বৎসরের শেষে স্থিতি			

নিরীক্ষকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল

সাধারণ সম্পাদক/কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল

ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচন

ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২ বছর এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক/প্রতিষ্ঠান পুঞ্জের ক্ষেত্রে ৩ বছর অন্তর নির্বাচনে নির্বাচন পরিচালনার জন্য কার্যকরী কমিটি একটি সাধারণ সভা আহ্বান করবেন এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য ১টি নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচনী সাব কমিটি গঠন করবেন। পরবর্তীতে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নিম্নোক্ত কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন।

সাধারণ সভার আহ্বান

১. নোটিশ প্রদান ৩০/৪৫ দিন পূর্বে।
২. নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন
৩. নির্বাচন কমিটি কর্তৃক নির্বাচন তফসিল ঘোষণা।
৪. নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা।
৫. ভোটার তালিকা হালনাগাদ।
৬. মনোনয়নপত্র বিলি।
৭. মনোনয়নপত্র জমা।
৮. মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই।
৯. মনোনয়নপত্র চূড়ান্তকরণ।
১০. প্রার্থীতা প্রত্যাহার।
১১. প্রতীক বরাদ্ধ।
১২. নির্বাচন পরিচালনা।
১৩. শ্রম অধিদপ্তরের প্রতিনিধি উপস্থিতিতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ।
১৪. সাধারণ সভার উপস্থিতিতে কোরাম হওয়া।
১৫. শ্রম অধিদপ্তরের প্রতিনিধির প্রতিবেদন পেশ।
১৬. নির্বাচন কমিশন স্বাক্ষরিত ফলাফল ঘোষণা।

নির্বাচন করতে না পারলে পূর্বের কমিটি বহাল থাকবে।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

আদর্শিক সংগঠনের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ

অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান

সাংগঠনিক পরিবেশ বলতে কী বুঝায়?

• সাংগঠনিক পরিবেশ বলতে সংগঠনের সামগ্রিক পরিবেশ বুঝায়। যা চোখে দেখা যায় না বা স্পর্শ করা যায় না। যা বাতাসের ন্যায় সর্বত্র বিরাজ করে এবং সংগঠনে সংগঠিত সকল কিছুকেই প্রভাবিত করে।

• সাংগঠনিক পরিবেশ হচ্ছে, একটি সংগঠনকে বর্ণনাকারী কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি যা একটি সংগঠনকে অন্য সংগঠন হতে পৃথক করে এবং সংগঠনের কর্মরত সর্বপর্যায়ের জনশক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে।

সাংগঠনিক পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব কী?

• আদর্শিক সংগঠনের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ হল সংগঠনের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ। যা সকল কিছুর উর্ধ্বে।

• সাংগঠনিক অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সংগঠনের গতিশীলতা ও গতিহীনতা সকল কিছুর জন্য দায়ী।

• সাংগঠনিক পরিবেশ নষ্ট হলে আদর্শিক আন্দোলন যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়ে, বিরোধী পক্ষ শত চেষ্টা করেও সে পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে না।

• বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন যেহেতু শ্রমিক ময়দানের একমাত্র আদর্শিক শ্রমিক সংগঠন সেহেতু এ সংগঠনের সাংগঠনিক পরিবেশ সংরক্ষণ অতীব জরুরি।

• বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমজীবী মানুষের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করছে। এ সংগ্রামকে সফল করার জন্য সিসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা পালন করার জন্য সাংগঠনিক পরিবেশ সংরক্ষণ খুবই জরুরি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, "মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার (বিরোধ দেখা দিলে) তাদের সম্পর্ক মীমাংসা করে দাও, আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের ওপর দয়া, অনুগ্রহ করা হবে।" (সুরা হুজরাত : ১০)

কাঙ্ক্ষিত পরিবেশের ধরন :

আদর্শিক আন্দোলনের কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ বলতে সংগঠনের অভ্যন্তরে জান্নাতি পরিবেশকে বুঝানো হয়। সংগঠনের অভ্যন্তরে জান্নাতি পরিবেশ তৈরিতে ৩টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে–

১. সর্বপর্যায়ের জনশক্তির আখেরাতের কল্যাণের চিন্তা;

২. দুনিয়াবী স্বার্থ ত্যাগের মানসিকতা এবং

৩. সকল তৎপরতার মূল লক্ষ্য হবে আখেরাত।

সাংগঠনিক পরিবেশ বিনষ্ট হয় কীভাবে?

১. সংগঠনের আদর্শের আলোকে জনশক্তিকে তৈরি করতে না পারলে।

২. দুর্বল নেতৃত্বের কারণে।

৩. নেতৃত্বের প্রতি কর্মীদের আস্থার অভাবে। (সিদ্ধান্ত নেওয়া, সিদ্ধান্ত দেওয়া ও দায়িত্ব বন্টনের ক্ষেত্রে)।

৪. আন্দাজ-অনুমান বেশি করা। কান কথাকে প্রাধান্য দেওয়া। তথ্য যাছাই-বাছাই করার প্রবণতা কম থাকা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হে ঈমানদারগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান গোনাহ। (সুরা হুজরাত: ১২)

৫. ইহতিসাবের পরিবর্তে গীবতের পথ বেছে নেওয়া।

• গীবত এক ধরনের মারাত্মক রোগ। এই রোগের প্রতিষেধকের জন্য ইহতিসাব চালু থাকা জরুরি। এটি একটি ফেতনা বিশেষ। কারণ মানুষ তার ভাইয়ের সামনে নয়; বরং পিছনে বসে নিন্দাবাদ করে। কুরআন গীবত করাকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাবার সঙ্গে তুলনা করেছে। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের কেউ যেন অপর কারো গীবত না করে। তোমরা কি কেউ আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করবে।" (সুরা হুজরাত : ১২)

কারো গীবত করা যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোনো ভাই কারো

ব্যাপারে গীবত করলে তাও ইসলামী শরীয়তে জায়েজ নেই। ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনাও নিজে গীবত করার শামিল।

হযরত মায়মুনা (রা.) বলেন, "একদিন আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, জনৈক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম, আমি কেনো একে ভক্ষণ করব? সে বলল, কারণ তুমি অমুক ব্যক্তির সাথী গোলামের গীবত করেছো। আমি বললাম, আল্লাহর কসম। আমি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলিনি। সে বলল, হ্যাঁ, এ কথা ঠিক; কিন্তু তুমি তার গীবত শুনেছো এবং এতে সায় দিয়েছো। এ ঘটনার পর হযরত মায়মুন (রা.) নিজে কখনো কারো গীবত করেননি এবং তা মজলিসে কাউকে গীবত করতেও দেননি।" (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন : ১২৮৪ পৃষ্ঠা)

৬. নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ইহতিসাবের সুযোগ কম দেওয়া। ইহতিসাবের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতার উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া। ইহতিসাবকে সহজভাবে মেনে নিতে না পারা।

৭. বদমেজাজ বা রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা।

• নির্দেশ বা আদেশ করার সময় Attitude স্বাভাবিক না রাখা। নির্দেশের ক্ষেত্রে মেজাজ বা রাগ প্রদর্শন করা পরিবেশ বিনষ্টের অন্যতম কারণ। এটাকে সবাই সমানভাবে নিতে পারে না।

• রাসুল (সা.) বলেছেন, "বলবান সে নয় যে কুস্তিতে অন্যকে পরাজিত করে বরং বলবান সে যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।" (সহিহ বুখারি)

• রাসুল (সা.) আরও বলেছেন, "যে আমাকে দুটি জিনিসের নিশ্চয়তা দিবে আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিব। দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী মাংসপিণ্ড (জিহ্বা) এবং দুই রানের মধ্যবর্তী মাংসপিণ্ড (লজ্জাস্থান)।"

৮. দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের অতিরিক্ত গাম্ভীর্যতা।

• নেতা নেতা ভাব দেখানো।

• আনুষ্ঠানিকতা বেশি দেখানো। যার ফলে অধস্তনরা কাছে আসার সুযোগ কম পায়। আপনি যত বড়ো দায়িত্বশীল হোন না কেনো অধস্তনকে কাছে আসার সুযোগ করে দিতে হবে।

• দায়িত্বশীলের সাথে জনশক্তির মন খুলে কথা বলতে না পারা।

• অতিরিক্ত কৈফিয়ত নেওয়া।

• জনশক্তির অভিভাবক হতে না পারা। অথচ জনশক্তিরা মা-বাবার পরে ভালোবাসার পাত্র দায়িত্বশীলকে মনে করে। দায়িত্বশীল অসুস্থ হলে বা সমস্যায় পড়লে জনশক্তিরা চিন্তিত হয়ে পড়ে।

৯. উদারতা প্রদর্শন করতে না পারা।

• নিজের সমালোচনা সহ্য করতে না পারা। দায়িত্বপূর্ণ জায়গায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রতি তীর্যক মন্তব্য বেশি আসা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে নেতৃত্বকে সকল অবস্থায় সমালোচনাকারীর প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে হবে।

• নিজের সমালোচনা নিজে করার অভ্যাস না থাকা।

• নিজের প্রশংসা শুনতে ভাল লাগা। তোষামোদকারীকে অগ্রাধিকার আর স্পষ্টবাদী জনশক্তির উপর বে-ইনসাফি আচরণ করা।

• নিজের ত্রুটি বা দুর্বলতা স্বীকার করার মানসিকতা না থাকা।

১০. বৈঠকের সিদ্ধান্তের আমানত রক্ষা করতে না পারা। সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় পোষণ করা।

১১. পরিবেশ পরিস্থিতি না বুঝে কথা বলা।

১৩. নিজের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে দায়িত্বশীলের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর বড়ো করে দেখা।

১৪. সংগঠন পরিচালনায় স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটানো। দায়িত্বশীল মনোনয়নে ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দকে প্রাধান্য দেওয়া।

১৫. মতামতের কুরবানি করতে না পারা। মতামত প্রকাশের জায়গায় মতামত প্রকাশ না করে ভিন্ন পদ্ধতিতে বা পরিবেশে মতামত উপস্থাপন করা।

১৬. সবাইকে নিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত না হয়ে নির্দিষ্ট কিছু জনশক্তির উপর বেশি নির্ভরশীলতা; যা অন্যদের নজরে পড়লে সাংগঠনিক পরিবেশ খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

১৭. দায়িত্বশীলের চিন্তা-চেতনায় স্বচ্ছতার বিপরীতে গোঁজামিলের আশ্রয় নেওয়া। যা জনশক্তিরা বুঝতে পারে।

১৮. দায়িত্বপূর্ণ জায়গায় থেকে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে অন্যকে হেয় বা ছোট করার মানসিকতা।

১৯. পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংগঠন পরিচালনা।

২০. দায়িত্বশীলের প্রদর্শনেচ্ছা মনোভাব। দায়িত্বশীলকে জনশক্তিরা উপরে তুলবে। নিজের ঢোল নিজে পেটানোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

২১. পারস্পরিক সম্পর্ক ভ্রাতৃত্ববোধের না হয়ে মেকাপ লাগানো হলে।

২২. সন্দেহকৃত বিষয় সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলকে না জানিয়ে অন্যকে জানানো।

২৩. নেতৃত্বের চারিত্রিক মানদণ্ড ত্রুটিযুক্ত হলে। লেনদেন ও মুয়ামেলাতে প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া।

কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সংরক্ষণে নেতৃত্বের ভূমিকা:

১. কথা বার্তা ও আচার-আচরণে অমায়িক হওয়া।

• সর্বাবস্থায় উত্তম ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া। নিজে সমস্যাগ্রস্ত থাকলেও আচরণে তা ফুটে উঠবে না।

• প্রেরণাদায়ক আলাপ-আলোচনা। নিজে সর্বদা উৎফুল্ল থাকা এবং জনশক্তিকে উৎফুল্ল রাখা।

• সংযত কথা বলা। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে কথা বলা। কম কথা বললে ভুলও কম হয়।

• সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক কথা ও ইতিবাচক ধারণা পোষণ করা।

• অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী হওয়া। মন খারাপ হলেও ব্যবহার খারাপ না করা।

• সমালোচনাকে হজম করা এবং সমালোচককে কদর করার যোগ্যতার অধিকারী হওয়া।

২. নেতৃত্বকে অখণ্ড সততার অধিকারী হওয়া।

• লেনদেন, আচার-আচরণ, নৈতিক চরিত্র, চাল-চলন সবকিছুতে পরিচ্ছন্ন হওয়া।

• ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক বিষয়ে স্বচ্ছতা অবলম্বন।

• সংগঠনের অর্থ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছ থাকা।

৩. সিসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় সংঘবদ্ধ থাকার চেষ্টা করা।

• সংগঠনের সকল জনশক্তি ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সম্প্রীতি স্থাপন করা।

• সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ করা।

• পরিবার-পরিজনের খোঁজখবর রাখা।

৪. নেতৃত্বকে বটবৃক্ষের ন্যায় ভূমিকা পালন করা।

• বটবৃক্ষ যেমন তার ঘন এবং আরামদায়ক ছায়ার দ্বারা ও পশু পাখিকে আশ্রয়ের মাধ্যমে প্রশান্তি দান করে এবং কখনো প্রতিশোধপরায়ণ হয় না অনুরূপভাবে নেতৃত্বকে বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে।

• নেতৃত্বকে জনশক্তির সান্ত্বনার উৎস হতে হবে।

• নেতৃত্বের মধ্যে মহব্বতের ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে। কর্মীরা নেতার কাছে দুঃখের পর গভীর প্রশান্তি লাভ করে।

• কেউ শত্রুতা করলে বা খারাপ জানলেও তাকে কাছে টেনে নেওয়ার মত উদারতা থাকতে হবে।

৫. সবাইকে সমান গুরুত্ব দেওয়া।

• সবাইকে আপন করে নেওয়া। যার যার যোগ্যতার আলোকে মর্যাদা দেওয়া।

• আঞ্চলিকতা পরিহার করা।

• নেতৃত্ব নির্বাচন ও মনোনয়নের ক্ষেত্রে তাক্বওয়া মাপকাঠিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

• সকলের ক্ষেত্রে সমান আচরণ করতে হবে। আপনার সাথে যার ভালো সম্পর্ক তার সাথে এক রকম আর অন্যের সাথে ভিন্নরকম এটা পরিহার করতে হবে।

৬. আনুগত্য, পরামর্শ ও ইহতিসাবের পরিবেশ বজায় রাখা।

• ইহতিসাব নিয়মানুযায়ী হতে হবে। অনেক সময় ইহতিসাবই পরিবেশ নষ্ট করে। নিয়মানুযায়ী ইহতিসাব করার সুযোগ দেওয়া ও ইহতিসাব গ্রহণ করা।

• পরামর্শভিত্তিক কাজ করা এবং অধস্তনদের পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া।

৭. গীবতের দরজা বন্ধ করা।

৮. শৃঙ্খলার ব্যাপারে আপোষ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সমাধান করার চেষ্টা করা। আনুগত্য, পর্দা ও নৈতিক অবক্ষয় এ জাতীয় মৌলিক বিষয় গোপন করা যাবে না।

৯. অধস্তনদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া। নেতৃত্বকে বলার চেয়ে শোনার অভ্যাস বেশি গড়ে তুলতে হবে।

১০. নেতৃত্বকে ভোগে নয়, ত্যাগে বিশ্বাসী হতে হবে।

১১. জনশক্তির প্রতি রহম দিল হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, "অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলো। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়তো। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" (সুরা আল ইমরান : ১৫৯)

১২. দায়িত্বের কারণে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার চেয়ে ব্যক্তিত্বসুলভ ব্যবহার দ্বারা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো।

১৩. নেতৃত্বকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনোভাব পরিহার করতে হবে। সংগঠনের টাকা খরচের ক্ষেত্রে আমানতদারিতার পরিচয় দিতে হবে, যাতে কেউ প্রশ্ন তোলার সুযোগ না পায়।

১৪. নেতৃত্বের প্রতি জনশক্তিদের বিশ্বাস ও আস্থার জায়গায় প্রশ্নবিদ্ধ না করা।

১৫. অধস্তনদের ভালো কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা।

সংগঠনের পরিবেশ কাঙ্ক্ষিত রাখার স্বার্থে যা বর্জন করতে হবে :

১. অশালীন ও অশোভন কথাবার্তা : রাসুল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট যার অশালীন ও অশোভন কথা থেকে বাঁচার জন্য লোক তাকে এড়িয়ে চলে।"

"যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হিফাজতের জামিন হবে আমি তার জান্নাতের জামিন হবো।"

"আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" (সহিহ বুখারি)

২. গীবত : কারও পশ্চাতে তার দোষক্রটি চর্চা করার নাম গীবত। যা আল্লাহর নিকট খুবই অপছন্দনীয়। মহান আল্লাহর বাণী, "দোষ অন্বেষণ করো না। তোমাদের কেউ যেন গীবত না করে। এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে নিজের মৃত ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া পছন্দ করবে? দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণ তওবা কবুলকারী ও দয়ালু।" (সুরা হুজরাত : ১২)

৩. আন্দাজ-অনুমান : আন্দাজ-অনুমান পরিহার সংগঠনের পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয় দিক। কেননা আন্দাজ-অনুমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংগঠনের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত করে। আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্দাজ-অনুমান করা থেকে বিরত থাক। কেননা কোনো কোনো আন্দাজ-অনুমান গুনাহের কাজ।" (সুরা হুজরাত : ১২)

৪. হিংসা : রাসুল (সা.) বলেন, "হিংসা থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয়ই হিংসা নেক কাজগুলোকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন লাকড়িকে খেয়ে ফেলে।" (আবু দাউদ)

৫. রাগ : মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে তার রাগ দমন করে। রাসুল (সা.) বলেছেন, "বলবান সে নয়, যে কুস্তিতে নিজেকে বিজয়ী করেছে বরং সেই বলবান যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারেন।" (সহিহ বুখারি)

৬. অহংকার : আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীকে ভালোবাসেন না" (সুরা লোকমান : ১৮)। রাসুল (সা.) বলেছেন, "যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

লেখক : সম্পাদক, দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তা।

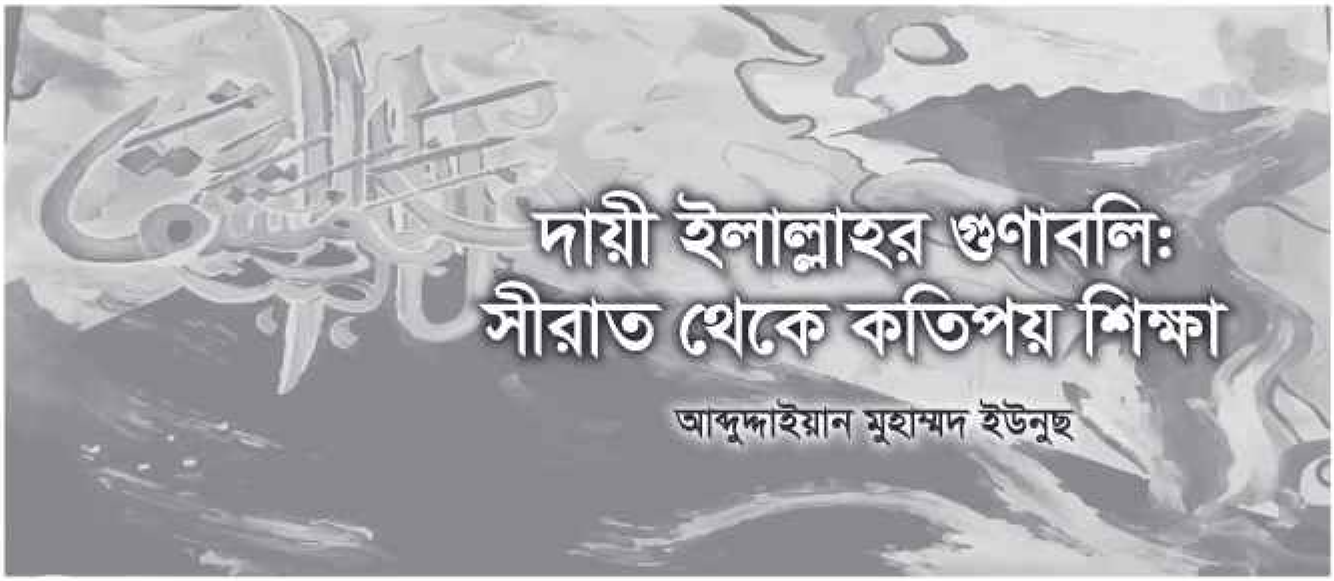

দায়ী ইলাল্লাহর গুণাবলি: সীরাত থেকে কতিপয় শিক্ষা

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

(২৬ তম সংখ্যার পর, শেষ পর্ব)

রুহামায়ু বায়নাহুম-পরস্পর সহানুভূতিশীল সম্পর্ক : আসহাবে রাসুল (সা.) ছিলেন সুশৃঙ্খল। এই কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর" (সুরা সফ: ৫)। মূলত যারা আল্লাহর রাসুলের দাওয়াতে সাড়া দিতেন তিনি তাদের যে শিক্ষা দিতেন তা হচ্ছে, 'Listen and obey' শুনো এবং আনুগত্য কর। অতএব আসহাবে রাসুল (সা.) তাঁর কথা শোনার জন্য মরিয়া থাকত। হযরত আবু হুরাইরা (রা) সব সময় মসজিদে নববীতে থাকতেন। আর তাঁদের বলা হতো আসহাবে সুফফা। আর কোনো সিদ্ধান্ত তাঁদের মনঃপূত না হলেও তা তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিতেন। এইভাবে শুনা ও আনুগত্য করার প্র্যাক্টিসের কারণেই অল্প সংখ্যক সাহাবারা বিরাট বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। মূলত একটি জামায়াত যত বড়োই হোক না কেন তার মধ্যে শৃঙ্খলা না থাকলে তাদের পক্ষে বড়ো কোনো টার্গেট হাসিল করা সম্ভব নয়। আর এই কারণেই ইমাম সাহেব প্রত্যেক নামাজের আগে তার মুসল্লিদের সফবন্দি হয়ে অর্থাৎ কাতার সোজা করে দাঁড়ানোর জন্য তাগিদ দেন। তিনি এই কথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে, দুই জন মুসল্লির মাঝে ফাঁকা থাকলে শয়তান এসে ঢুকে পড়ে। অতএব, যারা সমাজ বিপ্লব করতে চান তারা সুশৃঙ্খল না হলে এবং নেতৃত্বের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য না থাকলে তাদের পক্ষে সমাজ সংস্কার আন্দোলন নিরলসভাবে চালিয়ে যাওয়া কঠিন। আর নিজেদের মাঝে ঐক্য, সম্প্রীতি ও ভালোবাসা না থাকলে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে। পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি হলে আল্লাহ তায়ালার রহমত উঠে যায়। এই কারণে আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর সঙ্গী-সাথীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল "রুহামায়ু বায়নাহুম"। আর এই কথাটিই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এই ভাষায় উল্লেখ করেন, "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।" (সুরা ফাতহ: ২৯)

আল্লাহর রাসুলের প্রতি সাহাবাদের আনুগত্য ছিল দ্বিধাহীন। কিন্তু প্রয়োজনের আলোকে তাঁরা শ্রদ্ধা ও বিনয়মাখা ভাষায় জানতে চাইতেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার এই সিদ্ধান্ত কী আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত ওহির ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে না আপনার সিদ্ধান্ত এবং এতে কোনো মতামত দেওয়ার এখতিয়ার আছে কি না? সাহাবারা যে কোনো নির্দেশ জীবন দিয়ে হলেও বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট থাকতেন। তারপরও বিভিন্ন সময় দেখা যায় যুদ্ধ কৌশলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ থাকলে তাদের আপন মতামত ব্যক্ত করতেন। আর আল্লাহর রাসুল (সা.) কখনো কখনো তাদের মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে দ্বিধা করতেন না। যেমন বদর যুদ্ধে আল্লাহর রাসুল (সা.) যে স্থানে মুসলিম বাহিনীর জন্য বাছাই করেন তা হুবাব ইবনে মুনযের এর মতো একজন কম পরিচিতি সাহাবার পরামর্শে সে স্থান ত্যাগ করেন। কারণ তাঁর পরামর্শ ছিল পানির কূপ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং বদর কূপের পাশেই মুসলিম বাহিনী থাকা উত্তম। উক্ত সাহাবির যুদ্ধ কৌশল (War stretegy) আল্লাহর রাসুল (সা.) পছন্দ করেন এবং তার মতের আলোকেই স্থান নির্ধারণ করেন। খন্দকের যুদ্ধে হযরত সালমান ফারসীর পরামর্শক্রমেই পরিখা খনন করেন। কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া আর শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা এক কথা নয়। আবার কোথাও কোথাও তিনি আপন সিদ্ধান্তে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। যেমন হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে যখন প্রতিপক্ষ 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এর পরিবর্তে মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ লিখতে বলে তখন কোনো সাহাবিই রাসুলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেলতে চাননি। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসুল (সা.) নিজ হাতে উক্ত শব্দটি মুছে ফেলেন। যদিও কোনো কোনো সাহাবা এটাকে অপমানজনক চুক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা উক্ত সন্ধিকে "ফাতহুম মুবিন তথা মহা বিজয়" হিসাবে উল্লেখ করেন।

আসহাবে রাসুল (সা.)-এর আনুগত্যের নজির অসংখ্য। আল্লাহর রাসুল (সা.) পুরো মক্কী জীবনে সকল জুলুম নির্যাতন নীরবে সহ্য

করা ছিল আল্লাহর নির্দেশ। সে সময় কোনো প্রতিরোধ এর বিধান ছিল না। সাহাবারা নীরবে নির্যাতন সহ্য করেন। মক্কা থেকে হাবশা হিজরাত করেন কিন্তু কোনো পাল্টা আক্রমণ করেননি।

কষ্ট ও সহিষ্ণুতা : রাসুল (সা.) মক্কাতে ইসলামি দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বদা ধৈর্য অবলম্বনের পন্থা গ্রহণ করেছেন, কোনোভাবেই প্রতিরোধের চেষ্টা করেননি। এতে করে সাধারণ মানুষের নিকট ইসলামি দাওয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মানুষ বুঝতে পারে এ দাওয়াত মানুষের কল্যাণের জন্য। পবিত্র কুরআন মক্কার সুরা গুলোতে বারবার ধৈর্যের সাথে এ কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেছে। সবরের এ শিক্ষা আল্লাহ তায়ালা সকল নবিদেরকে দিয়েছেন। নুহ (আ.) দীর্ঘ নয়শত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ শুধু একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন, তার জাতির লোকেরা তার কথায় কোনো কর্ণপাত করেনি। ইব্রাহিম (আ.) দীর্ঘ সময় দাওয়াতের কাজ করেছেন তার দাওয়াতে লোকেরা তেমন সাড়া দেননি।

মূসা (আ.) কীভাবে বড়ো হলেন, মিশর থেকে হিজরত করে মাদায়েনে গেলেন কত ঘাত প্রতিঘাত ও সংগ্রাম করে দ্বীনের পথে তাকে চলতে হলো। তাকে কত কষ্ট ও ধৈর্য অবলম্বন করে দাওয়াতের কাজ করতে হলো, রাসুল (সা.) কে মক্কার লোকেরা কত কষ্ট দিল, তার সাহাবাদেরকে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হলো, তারপরও রাসুল (সা.) কে শিক্ষা দিলেন। "অতএব আপনি সবর করুন, যেমনি বড়ো বড়ো রাসূলগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না"। (সুরা আহকাফ: ৩)

তার সামনেই আম্মার, তার মা, তার পিতাকে মক্কার লোকেরা কঠিন শাস্তি দিচ্ছিল। তিনি শুধু বললেন, ইয়াসিরের পরিবার ধৈর্য ধরার তোমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে। (আল-হালাবীয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৩৭)

সকল পরিস্থিতি ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা : "হে ঈমানদারগণ সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও। হকের খিদমত করার জন্য উঠে পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে" (আলে-ইমরান: ২০০)। মাওলানা মওদুদী তাঁর 'ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী' গ্রন্থে ধৈর্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ধৈর্যের বহু অর্থ হয় এবং আল্লাহর পথে যারা কাজ করে তাদের এর প্রত্যেকটি অর্থের প্রেক্ষিতেই ধৈর্যশীল হতে হয়। ধৈর্যের এক অর্থ হচ্ছে তাড়াহুড়া না করা, নিজের প্রচেষ্টার ত্বড়িত ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা। ধৈর্যের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে তিক্ত স্বভাব, দুর্বলমত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া। ধৈর্যের আরেক অর্থ হচ্ছে বাধা বিপত্তির বিরোচিত মোকাবিলা করা এবং শান্ত চিত্তে লক্ষ্য অর্জনের পথে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট বরদাশত করা। ধৈর্যের আরেক অর্থ হচ্ছে, দুঃখ-বেদনা-ভারাক্রান্ত ও ক্রোধান্বিত না হওয়া, সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবেলায় সঠিক পথে অবিচল থাকা, শয়তানের উৎসাহ প্রদান ও নফসের খাহেশের বিপক্ষে

রাসুল (সা.) মক্কাতে ইসলামি দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বদা ধৈর্য অবলম্বনের পন্থা গ্রহণ করেছেন, কোনোভাবেই প্রতিরোধের চেষ্টা করেননি। এতে করে সাধারণ মানুষের নিকট ইসলামি দাওয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মানুষ বুঝতে পারে এ দাওয়াত মানুষের কল্যাণের জন্য। পবিত্র কুরআন মক্কার সুরা গুলোতে বারবার ধৈর্যের সাথে এ কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেছে। সবরের এ শিক্ষা আল্লাহ তায়ালা সকল নবিদেরকে দিয়েছেন। নুহ (আ.) দীর্ঘ নয়শত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ শুধু একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন, তার জাতির লোকেরা তার কথায় কোনো কর্ণপাত করেনি। ইব্রাহিম (আ.) দীর্ঘ সময় দাওয়াতের কাজ করেছেন তার দাওয়াতে লোকেরা তেমন সাড়া দেননি।

নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা। হারাম থেকে দূরে থাকা ও খোদার নির্দেশিত সীমার মধ্যে অবস্থান করা, গুনাহের যাবতীয় আরাম আয়েশ, লাভ প্রত্যাখ্যান করা এবং নেকি ও সততার পথে সকল প্রকার ক্ষতি ও বঞ্চনা সাদরে গ্রহণ করা।

তাদের অবস্থা এই যে, তারা তাদের রবের সন্তুষ্টির জন্য সবর করে, নামাজ কায়েম করে, গোপনে ও প্রকাশ্যে আমার দেওয়া রিজিক থেকে খরচ করে এবং মন্দকে ভালো দ্বারা দূর করে। আখেরাতের ঘর এ লোকদের জন্যই রয়েছে। অর্থাৎ তা এমন বাগান, যা তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে। তারা নিজেরাও তাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার তারাও সেখানে তাদের সাথে যাবে। আর ফেরেশতারা সব দিক থেকে তাদেরকে সমাদর জানাতে আসবে এবং তাদেরকে বলবে "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা দুনিয়ায় সবর করার বদলায় আজ এর ভাগী হয়েছো। তাই আখেরাতের ঘর কতই না ভালো।" (সুরা রা'দ: ২২-২৪)

আদর্শের বিজয়ের ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয় থাকতে হবে : এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন যে, তিনি এবং তাঁর রসুল অবশ্যই বিজয়ী হবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মহাশক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

"তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে তারা এমন লোকদের ভালবাসছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করেছে। তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র অথবা ভাই অথবা গোষ্ঠীভুক্ত হলেও তাতে কিছু এসে যায় না। আল্লাহ এসব লোকদের হৃদয়-মনে ঈমান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি 'রুহ' দান করে তাদের শক্তি যুগিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তারা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রেখো আল্লাহর দলের লোকেরাই সফলকাম।" (আল-মুজাদিলাহ: ২১-২২)

আর্থিক কুরবানি পেশ করা : এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল সব অবস্থায়ই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ দমন করে ও অন্যের দোষক্রটি মাফ করে দেয়। এ ধরনের সৎলোকদের আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবাসেন। আর যারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা কোনো গুনাহের কাজ করে নিজেদের ওপর জুলুম করে বসলে আবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে তাঁর কাছে নিজেদের গুনাহ খাতার জন্য মাফ চায় কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কে গুনাহ মাফ করতে পারেন এবং জেনে বুঝে নিজেদের কৃতকর্মের ওপর জোর দেয় না।" (আল ইমরান: ১৩৪-১৩৫)

সংকটকালে ত্যাগের নজরানা স্থাপন করতে হবে : এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "কী ব্যাপার যে, তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করছো না, অথচ জমিন ও আসমানের উত্তরাধিকার তাঁরই। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে অর্থ ব্যয় করবে ও জিহাদ করবে তারা কখনো সেসব বিজয়ের সমকক্ষ হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। বিজয়ের পরে ব্যয়কারী ও জিহাদকারীদের তুলনায় তাদের মর্যাদা অনেক বেশি। যদিও আল্লাহ উভয়কে ভাল প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। এমন কেউ কী আছে যে আল্লাহকে ঋণ দিতে পারে? উত্তম ঋণ যাতে আল্লাহ তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেন। আর সেদিন তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান।" (সুরা হাদিদ: ১০-১১)

যার কাছে যা বেশি প্রিয় তাকে সে বস্তু ত্যাগ করতে হবে : এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "তোমরা কখনো পূণ্যের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের পছন্দনীয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ জ্ঞাত" (সুরা আলে ইমরান: ৯২)। এই আয়াতটি নাজিল হবার পর সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকে নিজ নিজ সহায় সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য করলেন যে কোনোটি তাঁদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এরপর আল্লাহর পথে তা ব্যয় করার জন্য তাঁরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে আবেদন করতে লাগলেন। মদিনায় আনসারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবু তালহা (রা.)। মসজিদে নববী সংলগ্ন বিপরীত দিকে তাঁর একটি বাগানে বীরহা নামে একটি কূপ ছিল। বর্তমানে বাগানের স্থলে বাবে মজীদির সামনে "আস্তফা মনজিল" নামে একটি দালান রয়েছে। এতে মদিনা যিয়ারতকারী হাজীগণ অবস্থান করেন। এর উত্তর পূর্ব কোনে বীরহা কূপটি অদ্যবধি স্বনামে বিদ্যমান রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স.) মাঝে মধ্যে এ বাগানে প্রবেশ করতেন এবং বীরহা কূপ থেকে পানি পান করতেন। একূপের পানি তিনি পছন্দ করতেন। আবু তালহার এ বাগান অত্যন্ত মূল্যবান, উর্বর ও তাঁর বিষয় সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হবার পর তিনি রাসুলুল্লাহ (স.) এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার সব বিষয় সম্পদের মধ্যে বীরহা আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় আমি এটি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে চাই। আপনি যে কাজে পছন্দ করেন এটি তাতেই খরচ করেন। হুজুর (স.) বললেন বিরাট মুনাফার এ বাগানটি আমার মতে আপনি আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দিন। হযরত আবু তালহা এ পরামর্শ শিরোধার্য করে বাগানটি আত্মীয় স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন" (বুখারি ও মুসলিম)। এ হাদিস থেকে জানা গেল যে শুধু ফকীর মিসকিনকে দিলেই পুণ্য হয় না– পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনকে দান করারও বিরাট পুণ্য ও সওয়াবের কাজ। হযরত উসমান তাঁর সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দান করেছেন। আর হযরত আবু বকর তার যা ছিল সব কিছুই আল্লাহর রাসুলের কাছে উপস্থিত করেছেন।

মন্দের জবাব উত্তমভাবে দেওয়া : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "হে নবি, সৎ কাজ ও অসৎ কাজ সমান নয়। তুমি অসৎ কাজকে সে নেকি দ্বারা নিবৃত্ত করো যা সবচেয়ে ভাল। তাহলে দেখবে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে। ধৈর্যশীল ছাড়া এ

গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না। এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।" (হামীম-আস-সাজদাহ: ৩৪-৩৫)

পরস্পর বিবাদে লিপ্ত না হওয়া এবং আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা নষ্ট না করা : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোনো বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসুলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশে। আর আল্লাহর পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুত: আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে।

সর্বাবস্থায় সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলতে হবে : আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, এছাড়াও তাঁর নির্দেশ হচ্ছে এই, এটিই আমার সোজা পথ। তোমরা এ পথেই চলো এবং অন্য পথে চলো না। কারণ তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এ হেদায়াত তোমাদের রব তোমাদেরকে দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা বাঁকা পথ অবলম্বন করা থেকে বাঁচতে পারবে।

তারপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, যা সৎকর্মশীল মানুষের প্রতি নেয়ামতের পূর্ণতা এবং প্রত্যেকটি জিনিসের বিশদ বিবরণ, সরাসরি পথ নির্দেশ ও রহমত ছিল, (এবং তা এ জন্য বনি ইসরাঈলকে দেওয়া হয়েছিল যে,) সম্ভবত লোকেরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাতের প্রতি ঈমান আনবে। (সুরা আনআম: ১৫৩, ১৫৪)।

আল্লাহর সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা : ইসলামের বিজয়ের জন্য তাড়াহুড়া করা যাবে না, বিজয়ের জন্য আল্লাহর একটি নিয়ম নির্ধারিত রয়েছে, সে নিয়মনীতি পূর্ণ না হলে আল্লাহ কখনও দ্বীনকে বিজয় করবেন না, সেজন্য দীর্ঘ সবর, দৃঢ়তা, প্রচেষ্টা ও নিয়মিত দাওয়াতের কাজ করতে হবে। মক্কাতে যারা ঈমান এনেছিল রাসুল (সা.) তাদেরকে কাবার ঘরের মূর্তি ভাঙার নির্দেশ দেন নাই, কাফেরদের কাউকেও হত্যা করতে বলেননি। কেননা মূর্তির প্রতি ভালবাসা মুশরিকদের আংশিক ধর্মীয় কাজ। যদি তিনি তাদের এসব মূর্তি ভাঙার নির্দেশ দিতেন তাহলে তারা আরও বেশি করে নতুন নতুন মূর্তি তৈরি করত। কিন্তু যখন সময় সুযোগ আসল তখন তিনি সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন, ফাতেহ মক্কার দিন রাসুল (সা.) মুসলমানদেরকে নিয়ে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করেন অথচ মক্কার ঘরের আশে পাশে যে মূর্তি গুলো বসানো ছিল তিনি তা ভাঙতে দিলেন না কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মক্কার লোকেরাই তাদের মূর্তি গুলো ভেঙে সত্য দ্বীন গ্রহণ করল।

আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল : "আমরা কেন আল্লাহর উপর ভরসা করবো না, অথচ তিনিই আমাদের জীবনে চলার পথ দেখিয়েছেন? তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছো এতে আমরা সবর করবো। আর ভরসাকারীদের শুধু আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।" (সুরা ইবরাহীম: ১২)।

আল্লাহর সাহায্য থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না : কেউ কেউ আছেন তারা দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে বদরের মত ফেরেশতা কিংবা আবাবিল পাখি সব সময় কামনা করেন। তাঁদের সামনে আল্লাহর রাসুলের তায়েফ ও ওহুদের ঘটনাও রয়েছে। তবে আল্লাহর সাহায্য থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন "তারা মুখের ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তার আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে, তিনি তার রসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে" (সুরা আসসফ : ৮-৯)। রাসুল (সা.) সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "আল্লাহর শপথ! এ দ্বীনকে পূর্ণভাবে তিনি কায়েম করেই দিবেন। এমনকি সে সময় একজন সওয়ার সানয়া থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত চলে যাবে, কিন্তু সে আল্লাহ আর নিজের মেষ পালনের জন্য নেকড়ে ছাড়া আর কিছুর ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।" (রিয়াদুল সালেহীন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৯)

আল্লাহ মুমিনদেরকে রহমত থেকে নৈরাশ হওয়া হারাম করেছেন "কাফেরগণ ছাড়া কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হয় না" (সুরা ইউসুফ : ৮৭)। "বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।" (সুরা যুমার : ৫৩)

অতএব, যতই প্রতিকূল অবস্থা আসুক না কেন কোনো অবস্থাতেই হতাশ কিংবা মনোবল হারানো যাবে না। রাসুলে কারিম (সা.) বললেন, "এমন এক সময় আসবে যে তোমরা বন্যার পানির খড় কুটার মত পরিণত হবে। সাহাবারা প্রশ্ন করল হে আল্লাহর রাসুল (সা.) তার কারণ কী হবে? তিনি বলেন তোমাদের মধ্যে ওয়াহন সৃষ্টি হবে। তাঁরা প্রশ্ন করল ওয়াহন কী? তিনি জবাব দিলেন হুব্বুদ্দুনিয়া ওয়া কারাহিয়াতুল মাওত। দুনিয়া প্রেম ও মৃত্যু ভয় মানুষকে জিহাদ থেকে দূরে রাখে। ওহুদ যুদ্ধে যারা পিছপা হয়েছিল তারা মৃত্যু ভয়েও পালিয়েছিল।

আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা : আল্লাহ আমাদের জন্য যেই ফায়সালা করেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে। হে রাসুল! ওদেরকে বলুন, "আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা ছাড়া কখনো কোনো (ভালো বা মন্দ) কিছুই আমাদের কাছে পৌঁছে না। তিনিই আমাদের মনিব। মুমিনদেরকে আল্লাহরই উপর ভরসা করা উচিত।" (সুরা তাওবাহ: ৫১)

আল্লাহর দরবারে ধরনা দেওয়া : এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যে নেয়ামতই তোমরা পেয়েছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। তারপর যখন তোমাদের উপর কোনো কঠিন সময় আসে তখন তোমরা ফরিয়াদ নিয়ে তাঁরই দিকে দৌড়াও।" (সুরা নাহল: ৫৩)।

(সমাপ্ত)

লেখক: শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক গবেষক

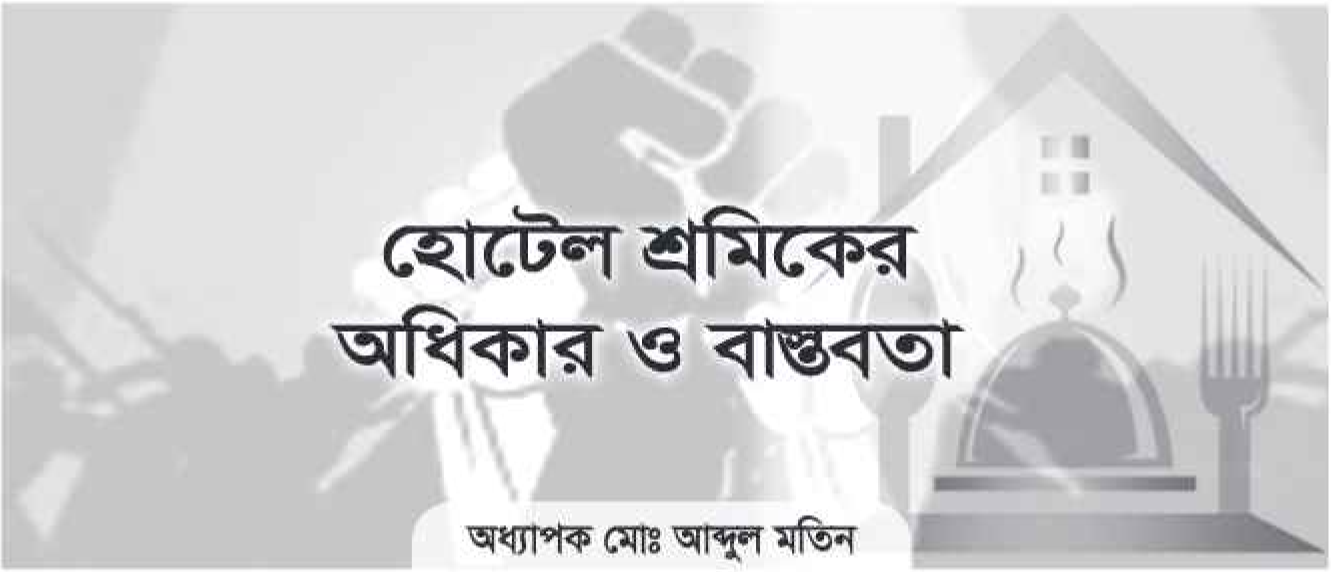

হোটেল শ্রমিকের অধিকার ও বাস্তবতা

অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মতিন

হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট সেক্টরের শ্রমিকগণ বাংলাদেশের শ্রমিক অঙ্গনের বৃহত্তম শ্রমিক সেক্টরের গর্বিত সদস্য। যারা মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য তৈরি ও পরিবেশনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রাচীন পেশাকে বক্ষে ধারণ করে যুগ যুগ ধরে মানুষের সেবা করে আসছে। এই সেবামূলক সেক্টরের শ্রমিকদের রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। বিদ্যমান রাষ্ট্র কাঠামো ও মালিক পক্ষের সৃষ্ট দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত সমস্যা ও পাহাড় সম নীরব কান্নার মানবিক সমাধান একান্ত প্রয়োজন। আমরা সকলেই জানি এদেশের হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিকগণ অন্য পেশার শ্রমিকদের মতই সমস্যার পাহাড় মোকাবেলা করে জীবন যুদ্ধে কোন রকমে টিকে রয়েছে। তাদের বাস্তব কিছু সমস্যা ও করণীয় নিয়ে আমার আজকের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

হোটেল শব্দটি ফ্রেঞ্চ বা ফরাসি শব্দ থেকে এসেছে। ১৬শ শতাব্দীতে মোগল আমলে ফরাসিগণ এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আসার পর থেকে খাবারের প্রয়োজনে হোটেলের প্রচলন শুরু হয়। যদিও সুলতানি আমলে সরাইখানার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং এই সরাইখানা ভ্রমণকারী অতিথিদের থাকা খাওয়া মৌলিক সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণ করতো। সময়ের ব্যবধানে সরাইখানার বিপরীতে জায়গা করে নিল হোটেল মোটেল রেস্টুরেন্ট বা রেস্তোরা।

হোটেল এমন একটি সংস্থা যা কেবলমাত্র স্বল্প-মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে টাকার বিনিময়ে থাকা ও খাবার ব্যবস্থা করে এবং অতিথিকে অসংখ্য সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে থাকে। সাধারণত হোটেল বলতে আমরা এ ধরনের ব্যবস্থাপনাকেই বুঝে থাকি। যুগের বিবর্তনে বা সময়ের ব্যবধানে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ জনপদের হাট-বাজারে নগর-বন্দর শহরে মানুষের আনাগোনা ও কর্মব্যস্ততা বেড়ে গেল। ফলে মানুষের ক্ষুধা নিবারণ বা খাদ্যের প্রয়োজনে গড়ে উঠলো খাবারের হোটেল। এলাকা ও অবস্থাভেদে এ হোটেল গুলো বিভিন্ন মানে ও নামে পরিচিতি লাভ করলো। কোথাও বাসের চাটাই দিয়ে তৈরি হল খাবার হোটেল, আবার কোথাও টিনের ঘরে। কোথাও আধাপাকা বিল্ডিংয়ে কোথাও আবার অতিথিদের মনোরঞ্জন ও সুখ সুবিধার বিবেচনায় আধুনিকতার ছোঁয়ায় অত্যাধুনিক বহুতল ভবনে গড়ে উঠল পাঁচ তারকা হোটেল। একতারা থেকে পাঁচ তারা বিভিন্ন নামে খ্যাত হোটেলগুলো অর্থের বিনিময়ে অতিথিগণকে জিম, সুইমিং পুল, চোখ ঝলসানো, বিনোদনের বিভিন্ন উপকরণসহ আধুনিক সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে।

অন্যদিকে, মোটেল একটি সংস্থা যা স্বল্প সময়ের জন্য অর্থের বিনিময়ে অতিথির খাবার ও বিশ্রাম বা আরামের ব্যবস্থা করে থাকে। এগুলো সাধারণত মহাসড়কের পাশে হয়ে থাকে। যেগুলোতে মোটরযান বা গাড়ি পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা রয়েছে । অপরদিকে রেস্টুরেন্ট বা রেস্তোরাঁ বলতে আমরা এমন একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কে বুঝি যেখানে খাবার তৈরি হয় এবং অর্থের বিনিময়ে তা গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করা হয়। হোটেল, মোটেল রেস্টুরেন্ট বা রেস্তোরাঁ যে নামেই ডাকা হোক না কেন উদ্দেশ্য ও কর্মের ধারা প্রায় একই।

মনুষ্য জাতির ভোজন ক্রিয়া ও রসনাবিলাস সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন তথা মানবকুলের আহার তৈরি ও পরিবেশনের কাজে হোটেল মোটেল ও রেস্টুরেন্টে যারা জড়িত থাকে তাদেরকেই আমরা এই পেশার শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি। কাজের ধরন অনুযায়ী এ পেশায় শ্রমিকদের নিম্নলিখিত উপাধি দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন বাবুর্চি বা সেফ, কারিগর, মেসিয়ার ও হোটেল বয়।

বাবুর্চি বা শেফ বলতে সাধারণত আমরা হোটেলে যারা ভাত, মাছ, মাংস, শাকসবজি রান্না বান্নার কাজ করে থাকে তাদেরকে বাবুর্চি বা সেফ বলে থাকি। আর মিষ্টান্ন জাতীয় খাবার যারা তৈরি করেন তাদেরকে কারিগর এবং যারা খাবার টেবিলে খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় সরবরাহ করে থাকে তাদেরকে মেসিয়ার এবং পরিচ্ছন্নতার কাজ যেমন প্লেট ধোঁয়া, টেবিল পরিষ্কার করা সহ অন্যান্য আরও ছোটখাটো কাজে নিয়োজিত থাকে তাদেরকে হোটেল বয় বলা হয়ে থাকে। তবে যে নামেই ডাকা হোক না কেন সকলকে আমরা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট শ্রমিক হিসেবে গণ্য করি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত 'হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট সার্ভে ২০২১'

এর প্রতিবেদন অনুযায়ী এদেশে হোটেলের সংখ্যা ৪ লাখ ৩৬ হাজার ২৭৪টি। আর এই পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ২০ লক্ষ ৭১ হাজার। তবে বেসরকারি ও অন্যান্য তথ্যসূত্রে এ পেশার নিয়মিত ও অনিয়মিত শ্রমিক সংখ্যা ৩০ লাখেরও বেশি হবে। অঙ্কের হিসাবে যাই হোক না কেন দিব্য চোখেই তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশাল এক জনগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে এদেশের হোটেল, মোটেল ও রেস্টুরেন্ট গুলোতে আমাদের জন্য আহার তৈরি ও পরিবেশনের কাজে ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু বাস্তব সত্য কথা হলো যে আজ তারা নানাবিধ জুলুম ও বৈষম্যের শিকার। বড় দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, আগুনের তাপ ও ধোঁয়া সহ্য করে যারা সারাদিন ধরে অন্যের আহার তৈরি করার কাজে ব্যস্ত থাকে দিনশেষে তাদের চুলায় ওঠে না ভাতের হাড়ি। হয় না তাদের পরিবারের আহারের ব্যবস্থা। নেই তাদের চাকরির নিশ্চয়তা, নেই জীবনের নিরাপত্তা, কিংবা সম্মানজনক সামাজিক অবস্থান। মালিক ও রাষ্ট্রক্ষের নানাবিধ অবজ্ঞা ও অবহেলা শিকার হয়ে বছরের পর বছর মৌলিক মানবীয় চাহিদা হতে বঞ্চিত। ক্ষেত্র বিশেষে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করে জীবন জীবিকার তাগিদে এই পেশাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। বাস্তবতার আলোকে এ পেশার কিছু চলমান সমস্যা ও করণীয় বিষয়ে উল্লেখ করা হলো।

সমস্যা:

রমজান মাসে মজুরি না পাওয়া : বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। ইসলামের বিধান অনুযায়ী দিনের বেলা পানাহার নিষিদ্ধ। তাই ইসলামি নীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের সুবিধার্থে দিনের বেলা অধিকাংশ হোটেল রেস্টুরেন্ট বন্ধ রাখা হয়। মালিক শ্রমিক সকলেই চাই এই মাসে একটু বেশি ইবাদত বন্দেগি করে আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে। মালিক শ্রমিক সকলে রোজা রাখলেও এখানে ঘটনা একটু ভিন্ন রকমের ঘটে। এ মাসে শ্রমিকগণ কোন বেতন ভাতা পায় না। অন্যান্য মাসে যা বেতন পায় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে তা থেকে যে কিছু সঞ্চয় করে রাখবে সে সুযোগও তাদের হয় না। ফলে রোজার মাসে সেহরি ও ইফতারি খাওয়ার মত কোন খাদ্য উপকরণ তাদের কাছে থাকে না। অনেক সময় পরিবার-পরিজন নিয়ে না খেয়ে রোজা রাখেন আর পানি মুখে দিয়ে ইফতারি করেন। এরপর ঈদের দিনে হয় আরেক কষ্ট। এই পেশার শ্রমিকের সন্তানেরা অন্যদের নতুন পোশাক দেখে যখন পিতা-মাতার কাছে এসে বায়না ধরে তখন হতভাগা শ্রমিকদের নিরবে চোখের জল মুছা ছাড়া আর করার কিছুই থাকে না।

নিয়োগপত্র না থাকা : শ্রমিকদের অন্যতম আরেকটা সমস্যা হচ্ছে নিয়োগপত্র ও চাকরির বিধিমালা না থাকা। দেশের প্রচলিত শ্রম আইন ও বিধিমালা কে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখায় মালিকগণ যুগ যুগ ধরে দৈনিক হাজিরা প্রথার ভিত্তিতে মজুরি দিয়ে আসছে। দৈনিক হাজিরা প্রথার ভিত্তিতে শ্রমিকদের ভাগ্যের কোন উন্নয়ন হয় না, কারণ এই প্রথায় রয়েছে কথায় কথায় ছাঁটাই এর ব্যবস্থা। ফলে শ্রমিকদের সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। আর এভাবে ভয়ে ভয়ে থাকতে থাকতে একসময় তারা মালিকদের সামনে উচিত কথা বলার ন্যূনতম সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলে। কর্মহারার চিন্তা সব সময় তাকে তাড়া করে ফিরে। এই বুঝি তার কর্মটা চলে গেল। এইভাবে নানা রকম চিন্তা ও আতঙ্কে থাকতে থাকতে অসতর্কতা বসত হঠাৎ তার হাত থেকে গ্লাস বা প্লেট পড়ে ভেঙে গেলে গুনতে হয় জরিমানা, শুনতে হয় মালিকের অসভ্য গালিগালাজ। কোনো সময় জোরে কথা বললে মালিকের লেলিয়ে দেওয়া মাস্তানদের চড় থাপ্পড় তথা শারীরিক নির্যাতনেরও শিকার হতে হয়। বিকল্প কোনো কর্ম না থাকায় নিরুপায় হয়ে ওই মালিকের অধীনেই কোনোরকমে কর্মটি চালিয়ে যেতে হয়।

উৎসব ভাতা ও অতিরিক্ত কর্মের মজুরি না থাকা : যেহেতু এই পেশার শ্রমিকদের কোন নিয়োগ নেই, তাই তারা কোন উৎসব ভাতা পায় না। ফলে বছরে দুই ঈদ কিংবা পূজা পার্বনে অন্যেরা যখন আনন্দ করে তখন এই পেশার শ্রমিকেরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে আর আফসোস করতে থাকে। হায়! আমরাও তাদের মত মানুষ। আমাদের ভাগ্যে কেন নতুন পোশাক জোটে না? আমরা কেন আনন্দ করতে পারি না? এরূপ আফসোস নিজের কাছে হাজারো প্রশ্ন করা ছাড়া তো তাদের আর করার কিছুই নেই। আগুনের তাপ ও ধোঁয়া সহ্য করে ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে করতে করে এক সময় তারা দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়লে তখন তাদেরকে দেখার মত আর কেউ থাকে না। বৃদ্ধ বয়সে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। এভাবে খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে এক সময় খুবই করুণভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

বাস্তবতার আলোকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ক. কার্যকর মজুরি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে আধুনিক জীবন ব্যবস্থা ও বাজার ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে মজুরি নির্ধারণ।

খ. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বেকার শ্রমিকদের মাসিক ভাতা ব্যবস্থা চালু করা।

গ. রমজান মাসে পূর্বের যেকোনো এক মাসের সমান বেতন সাপেক্ষে ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করা। সেই সাথে মুসলমানদের জন্য দুই ঈদে, হিন্দুদের জন্য দুর্গা পূজায় এবং সকলের জন্য বৈশাখী উৎসব ভাতা চালু করা।

ঘ. নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র চালু ও সার্ভিস বেনিফিট প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ঙ. সাপ্তাহিক ও উৎসব ছুটির ব্যবস্থা ও ওভারটাইমে জন্য বিশেষ মজুরি নির্ধারণ।

চ. কথায় কথায় শ্রমিক ছাঁটাই ও শারীরিক-মানসিক নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ করা।

ছ. স্বাস্থ্যসম্মত কাজের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, বিশুদ্ধ পানির সুব্যবস্থা করা।

ঝ. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের সন্তানদের অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

যেহেতু হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট রাজস্ব আদায়ের একটি সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি খাত। সেহেতু এ খাতে সেবার মান বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশি-বিদেশী অতিথি, পর্যটকদের আকৃষ্ট করে প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখা সম্ভব।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

প্রশ্নোত্তরে মজুরি ও মজুরি বোর্ড

অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

১. প্রশ্ন: নিম্নতম মজুরি বোর্ড কী এবং এটি কোন আইনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৩৮ ধারায় নিম্নতম মজুরি বোর্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে, উক্ত ধারায় ১নং উপধারায় বলা হয়েছে, সরকার নিম্নতম মজুরি বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করবে। ২নং উপধারায় বলা হয়েছে, নিম্নতম মজুরি বোর্ড অতঃপর এই অধ্যায়ে মজুরি বোর্ড বলে উল্লিখিত, নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। একজন চেয়ারম্যান, একজন নিরপেক্ষ সদস্য, মালিক ও শ্রমিকের পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে মজুরি বোর্ড গঠিত হবে।

২. প্রশ্ন: নিম্নতম মজুরি বোর্ডের কাজ কী?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৩৯ ধারায় মজুরি বোর্ডের কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে। নিম্নে কাজগুলি উল্লেখ করা হলো:

ক. মজুরি বোর্ড শ্রমিকগণ বা শ্রমিক শ্রেণির জন্য নিম্নতম মজুরি হার সুপারিশ করতে পারবে।

খ. মজুরি বোর্ড ৬ মাসের মধ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করবে, তবে মজুরি বোর্ডের অনুরোধে এই সময় বৃদ্ধি হতে পারে।

গ. মেয়াদী কাজ এবং ঠিকা কাজের জন্য নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ করবে।

ঘ. মজুরি বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত মেয়াদী হার ঘন্টা, দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে হতে পারে।

৩. প্রশ্ন: ন্যূনতম মজুরি হার কত বছর পর পর নির্ধারণ হয়?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৩৯ ধারার ৬ নং উপধারায় বলা হয়েছে, কোনো শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের জন্য স্থিরকৃত নূন্যতম মজুরি হার সরকারের নির্দেশনাক্রমে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পুনঃনির্ধারণ করবে।

৪. প্রশ্ন: নিম্নতম মজুরি হার ঘোষণার ক্ষমতা কার?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৪০ ধারায় বলা হয়েছে, ধারা ১৩৯ এর অধীন মজুরি বোর্ডের সুপারিশ পাবার পর সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করতে পারবে যে, মজুরি বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন শ্রমিকের জন্য সুপারিশকৃত নিম্নতম মজুরির হার, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে উক্তরূপ শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মজুরি হার হবে।

৫. প্রশ্ন: সংবাদপত্র শ্রমিকগণের মজুরি বোর্ড কী আলাদা হবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৪৩ ধারায় সংবাদপত্র শ্রমিকগণের জন্য আলাদা মজুরি বোর্ড এর কথা বলা হয়েছে। সংবাদপত্র শ্রমিকগণের মজুরি নির্ধারণের জন্য সংবাদপত্র শ্রমিক মজুরি বোর্ড নামে একটি স্বতন্ত্র মজুরি বোর্ড গঠন করতে হবে। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন চেয়ারম্যান এবং সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের মালিক ও সংবাদপত্র শ্রমিকগণের প্রতিনিধিত্বকারী সমসংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে সংবাদপত্র শ্রমিক মজুরি বোর্ড গঠিত হবে।

৬. প্রশ্ন: নিম্নতম মজুরি প্রত্যেক মালিকের উপর অবশ্য পালনীয় কী?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৪৮ ধারায় বলা হয়েছে, মজুরির নিম্নতম হার সংশ্লিষ্ট সকল মালিকের উপর অবশ্য পালনীয় হবে এবং প্রত্যেক শ্রমিক উক্তরূপ ঘোষিত বা প্রকাশিত মজুরির অন্যূন হারে মজুরি পেতে অধিকারী হবে।

শ্রম আইনের ১৪৯ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো মালিক কোনো শ্রমিককে ঘোষিত বা প্রকাশিত নিম্নতম হারের কম হারে কোন মজুরি প্রদান করতে পারবেন না।

৭. প্রশ্ন: মজুরি পরিশোধের দায়িত্ব কার?

উত্তর: শ্রম আইনের ১২১ ধারায় মজুরি পরিশোধ দায়িত্ব কার সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক মালিক কর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যেক শ্রমিককে সকল মজুরি পরিশোধ করার জন্য দায়ী থাকবেন।

৮. প্রশ্ন: মজুরি পরিশোধের সময় কত দিন?

উত্তর: শ্রম আইনের ১২৩ ধারায় মজুরি পরিশোধের সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে। ১২৩ ধারার ১ নং উপধারায় বলা হয়েছে, কোন শ্রমিকের যে মজুরিকাল সম্পর্কে তার মজুরি প্রদেয় হয় সেই কাল শেষ হবার পরবর্তী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে তার মজুরি পরিশোধ করতে হবে। ২ উপধারায় আরও বলা হয়েছে, যে ক্ষেত্রে কোন শ্রমিকের চাকরি তার অবসর গ্রহণের কারণে অবসান হয় অথবা মালিক কর্তৃক তার চাকরি অবসান হয় সেক্ষেত্রে উক্ত শ্রমিককে প্রদেয় সকল মজুরি তার চাকরি অবসানের তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

৯. প্রশ্ন: শ্রমিকের মজুরি কিসের মাধ্যমে পরিশোধ করবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ১২৪ ধারায় বলা হয়েছে, সকল মজুরি প্রচলিত মুদ্রা, কারেন্সী নোট অথবা ব্যাংকের চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। এছাড়াও শ্রমিকের ব্যাংক একাউন্টে ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরাসরি পরিশোধ করা যাবে।

১০। প্রশ্ন: ক্ষতি বা বিনষ্টির জন্য মালিক কোনো মজুরি কর্তন করতে পারবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ১২৫ ধারায় ক্ষতি বা বিনষ্টির জন্য মালিক কোন মজুরি কর্তন করতে পারবে কি না সে সম্পর্কে বলা হয়েছে। উক্ত ধারার ২ উপধারা বলা হয়েছে, এই আইন দ্বারা অনুমোদিত কর্তনের ক্ষেত্র ব্যতিত অন্য কোনো ক্ষেত্রে কোনো শ্রমিকের মজুরি হতে কিছুই কর্তন করা যাবে না। কেবলমাত্র এই আইনের বিধান অনুযায়ী কোন শ্রমিকের মূল মজুরি হতে কর্তন করা যাবে তবে কোন কর্তন সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের অবহেলা বা গাফিলতির কারণে ঘটিত মালিকের ক্ষতি বা বিনষ্টির পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হবে না এবং উক্তরূপ কোন কর্তন করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত কর্তনের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচারের নীতি অনুসরণ করে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে উক্ত শ্রমিককে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

১১. প্রশ্ন: মৃত ও নিখোঁজ শ্রমিকের অপরিশোধিত মজুরি কে প্রাপ্য হবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৩১ ধারায় বলা হয়েছে, কোন শ্রমিককে মজুরি হিসেবে প্রদেয় সকল অর্থ তার মৃত্যুজনিত কারণে অথবা তার কোনো খোঁজ না পাওয়া গেলে শ্রমিক কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা মৃত শ্রমিকের আইনগত উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণকে তা প্রদান করা হবে। কোনো মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী না থাকলে অথবা পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে কোনো কারণে উক্তরূপ কোনো মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে উক্ত অর্থ প্রদান করা সম্ভব না হলে প্রদেয় অর্থ সরকারি ফান্ড শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে জমা হবে। ২ নং উপধারায় বলা হয়েছে, পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীর খোঁজ না পাওয়া গেলে জমারত অর্থ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থ বলে বিবেচিত হবে।

১২. প্রশ্ন: মজুরি কর্তন বা মজুরি বিলম্বে পরিশোধ করলে কোথায় দাবি তুলে ধরতে হবে?

উত্তর: শ্রম আইনের ১৩২ ধারায় বলা হয়েছে, যে ক্ষেত্রে আইনের বিধান লঙ্ঘন করে কোন শ্রমিকের মজুরি কর্তন করলে অথবা মজুরি পরিশোধ না করে অথবা তার মজুরি বা কোন বিধির আওতায় প্রদেয় গ্রাচ্যুইটি বা ভবিষ্যৎ তহবিলের প্রাপ্য পরিশোধ বিলম্বে ঘটে সে ক্ষেত্রে তিনি, অথবা তার মৃত্যু হলে তার কোনো উত্তরাধিকারী অথবা আইনসঙ্গত প্রতিনিধি কর্তৃক মজুরি ফেরত পাবার জন্য অথবা বকেয়া বা বিলম্বিত মজুরি ও অন্যান্য পাওনা আদায়ের জন্য শ্রম আদালতে দরখাস্ত দাখিল করতে পারবেন।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তা ও আইনজীবী, লেবার কোর্ট, ঢাকা।

লেখা আহ্বান

দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্খী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে দ্বি-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৪০৩৯০৯১৮৯, ০১৮২২০৯৩০৫২

E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

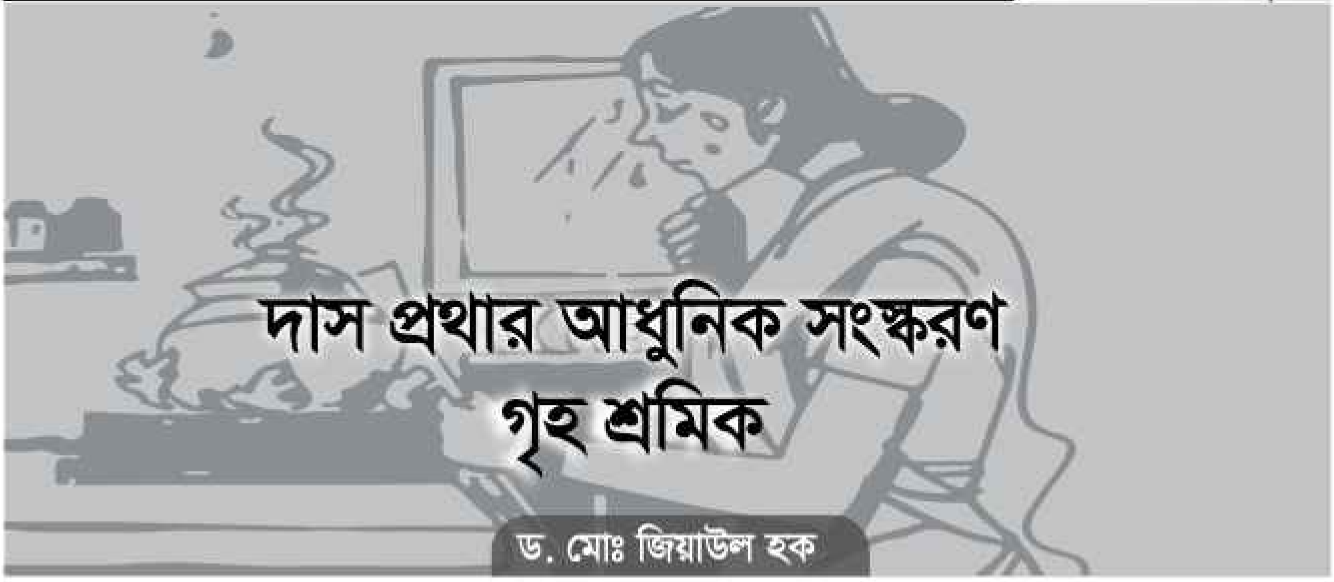

দাস প্রথার আধুনিক সংস্করণ গৃহ শ্রমিক

ড. মোঃ জিয়াউল হক

বহুপূর্বে পৃথিবী থেকে দাসপ্রথা বিলোপ হলেও বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে দাসপ্রথার আধুনিক সংস্করণ মনে করা হচ্ছে গৃহ শ্রমিককে। গৃহ শ্রমিকরা প্রতিনিয়তই শোষণ, নির্যাতন-নিপীড়ন ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। সময় এসেছে গৃহ শ্রমিকদের কাজের স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রদান এবং তাদের ওপর থেকে সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং হয়রানি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার। অন্যথায় গৃহ শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন ও মৃত্যুর মিছিল বাড়তেই থাকবে। গৃহ শ্রমিকদের বিষয়ে সরকারের অধিক মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এদের জন্য আইন প্রণয়নের পাশাপাশি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে কাজ করা দরকার। গৃহ শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। আইএলও, বিভিন্ন দেশের জাতীয় জরিপের ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্বে ৫ কোটি ২৬ লাখ গৃহ শ্রমিক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সংখ্যা আরও বেশি। কেননা অনেক দেশেই এ সংক্রান্ত যথাযথ হিসেব করা সম্ভব হয়নি। তবে সংখ্যা যাই হোক না কেন, সারাবিশ্বের গৃহ শ্রমিকের অবস্থায় তেমন কোনো পার্থক্য নেই। এখন গৃহ শ্রমিক বিষয়টাকে একটু সরলভাবে যদি বলি তাহলে, আধুনিক শ্রমদাসত্বের একটি রূঢ় বাস্তবরূপ হচ্ছে বিশ্বের এই বিপুলসংখ্যক গৃহ শ্রমিক।

গৃহ শ্রমিক কারা : সাধারণভাবে গৃহ শ্রমিকের চাকুরির সম্পর্কের ভিত্তিতে মৌখিক বা লিখিত যে কোনো উপায়ে খণ্ডকালীন অথবা পূর্ণকালীনভাবে স্বল্প মজুরিতে গৃহকর্মে নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা কর্মীকে 'গৃহ শ্রমিক' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। আরেকটু বললে গৃহকর্ত্রীকে গৃহস্থালির কাজেকর্মে সহায়তা করা, কোনো বাসা বা মেসে রান্নাবান্নাসহ যাবতীয় কাজ করার জন্য স্থায়ী বা অস্থায়ী ভিত্তিতে যে নারী, শিশু এমনকি পুরুষ নিয়োগপ্রাপ্ত হয় তাদের গৃহ শ্রমিক বলে।

গৃহ শ্রমিক বৃদ্ধির কারণ : বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, প্রভৃতির কারণে ফসলহানি, কৃষিভূমি হ্রাস, বাড়ি-ঘর ধ্বংস এবং গ্রামে কাজের অভাবসহ নানাবিদ কারণে গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাজের সন্ধানে শহরমুখী ভূমিহীন ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ। এইসব দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের মধ্যে নারী এবং শিশুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। কোন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত এসব নারীর অধিকাংশই শহরে এসে সবচেয়ে সহজলভ্য গৃহশ্রমের কাজটিকে জীবিকার জন্য বেছে নেয়। ফলে ক্রমান্বয়ে গৃহ শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে গৃহ শ্রমিকদের বৈশিষ্ট্য : গৃহ শ্রমিকদের কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ ও কর্মঘণ্টা নেই, কাজের কোনো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং নিরাপত্তা নেই, সুনির্দিষ্ট কোনো বেতন কাঠামো নেই, চাকুরির বিধিমালা নেই, নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র নেই, ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলা ও পেশাগতভাবে সংগঠিত হওয়ার কোনো সুযোগ ও অধিকার নেই, অধিকাংশেরই প্রতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই, পেশাগত নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার নেই।

গৃহ শ্রমিকের শ্রেণি বিভাগ : গৃহ শ্রমিকের শ্রেণি বিভাগ পূর্বের কোনো গবেষণায় কিংবা বই-পুস্তকে গৃহ শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট কোনো শ্রেণি বিভাগ পাওয়া যায়নি। তবে গৃহ শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। যেমন বয়সকাঠামোর ভিত্তিতে গৃহ শ্রমিকদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা শিশু-কিশোর গৃহ শ্রমিক, মধ্যবয়সী গৃহ শ্রমিক, বৃদ্ধবয়সী গৃহ শ্রমিক। লিঙ্গের ভিত্তিতে গৃহ শ্রমিকদের দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা পুরুষ গৃহ শ্রমিক, নারী গৃহ শ্রমিক। কর্মস্থলের ভিত্তিতে গৃহ শ্রমিককে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা মালিকের বাসায় থেকে কর্মরত গৃহ শ্রমিক, মালিকের বাসার বাইরে থেকে কর্মরত গৃহ শ্রমিক, মেস বাড়িতে কর্মরত গৃহ শ্রমিক। সময়ের ভিত্তিতে গৃহ শ্রমিককে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা খণ্ডকালীন গৃহ শ্রমিক, পূর্ণকালীন গৃহ শ্রমিক।

গৃহ শ্রমিকদের নির্যাতনের কারণ ও ধরন : গৃহ শ্রমিকদের অপরাধ ও নির্যাতন-নিপীড়ন গৃহ শ্রমিকদের জন্য একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

গৃহ শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের চিত্র মাঝে মধ্যে খুব সামান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়া ছাড়া অন্য কোনো গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। সমাজের উচ্চশ্রেণি থেকে শুরু করে নিম্নশ্রেণি পর্যন্ত প্রায় সকলেই গৃহ শ্রমিক নির্যাতনে সিদ্ধহস্ত। দেখা গেছে, কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়া, ঘুম থেকে উঠতে দেরি করা, বাসন বা কাপ পিরিচ ভেঙে ফেলা, ডাকে সাড়া দিতে একটু দেরি করা, বেশিক্ষণ বাথরুমে থাকা, শব্দ করে কান্না করা, মিথ্যা চুরির অভিযোগ করা, গৃহকর্তা বা তাঁর ছেলের অশ্লীল ইঙ্গিতে সাড়া না-দেওয়া প্রভৃতি কারণে গৃহকর্ত্রী বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের হাতে গৃহ শ্রমিকদের নিগৃহীত বা নির্যাতিত হতে হয়।

গৃহশ্রমিকের ওপর যে নির্যাতন ও শাস্তি প্রদান করা হয়, সেগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

শারীরিক নির্যাতন : গৃহশ্রমিকদের ওপর যে ধরনের শারীরিক নির্যাতন হয় সেগুলো হলো, গরম খুন্তি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছ্যাঁকা, রড বা লাঠিপেটা, বেতের আঘাত, দেওয়ালের সাথে চেপে ধরে মাথায় আঘাত, ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া, নির্যাতনের পর বাথরুমে বেঁধে রাখা, হাত ও পা ভেঙে দেওয়া, নির্যাতনের পর শরীরে আগুন দেওয়া, চড় থাপ্পড়, লাথি, গোপনাঙ্গে মরিচ ভেঙে দেওয়া, বিবস্ত্র করে মুখ, পিঠ ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে জখম, অ্যাসিড নিক্ষেপ, অনৈতিক সম্পর্কের ফলে অন্তসত্ত্বা করে ফেলানো।

মানসিক নির্যাতন : গৃহ শ্রমিকদের ওপর যে ধরনের মানসিক নির্যাতন হয় সেগুলো হলো মাটির সানকিতে খেতে দেওয়া, রিক্তর পাদানিতে বসতে দেওয়া, রান্নাঘর, বারান্দায় শুতে দেওয়া, বাসি-পচা খাবার খেতে দেওয়া এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে একসাথে খেতে না-দেওয়া, টিভি দেখার সময় একই সাথে বসতে না-দিয়ে মেঝেতে বসতে দেওয়া, বাইরে বেড়াতে গেলে বাড়িতে তালা মেরে রেখে যাওয়া, কোনো কিছু হারালে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা, ভালো জামাকাপড় পরতে না-দেওয়া, অশালীন ও অমর্যাদাকর বাক্য ব্যবহার করা, অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত রাখা।

বাংলাদেশে গৃহ শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের চিত্র বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে আমরা যে সমীক্ষা লক্ষ্য করি তা ভয়াবহ। তাদের ওপর হত্যা, ধর্ষণসহ নানা প্রকার নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির তথ্য মতে, ২০০৮ সালে সারাদেশে মোট ১২১ জন গৃহ শ্রমিক বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ৩৩ জন শারীরিক নির্যাতন, ২৬ জন খুন, ১৮ জন ধর্ষণ, ১ জন গণধর্ষণ, ১০ জন ধর্ষণের পর খুন, ২ জন আত্মহত্যা করেছে, ১১ জন অস্বাভাবিক মৃত্যুর শিকার হয়েছে। নির্যাতনের শিকার বেশিরভাগের বয়সই ১৮ বছরের নিচে। মোট ১২১টি ঘটনার মধ্যে ৯৪টি ঘটনায় মামলা হয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালে বিভিন্ন পত্রিকায় মোট ৭৭টি গৃহ শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৯ জন, ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৪ জন, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ১ জনকে, শারীরিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে ২০ জনকে এবং নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে আত্মহত্যা করেছে ৮ জন গৃহ শ্রমিক। নাগরিক উদ্যোগের তথ্য সেলের সমীক্ষায় দেখা গেছে, জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১১ সময়ে সারাদেশে ৩৮ জন গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যার মধ্যে গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী ও তাঁদের আত্মীয়দের দ্বারা নির্যাতিত এবং ছাদ থেকে পড়ে আহত হয়েছে ১৫ জন, শারিরীক নির্যাতনের ফলে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। নির্যাতন সইতে না-পেরে ছাদ থেকে পড়ে এবং গলায় ওড়না প্যাঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে ১১ জন। গৃহকর্তার অনৈতিক সম্পর্কে অন্তসত্ত্বা হয়েছে ২ জন। গৃহকর্ত্রীর আত্মীয়ের হাতে ধর্ষণচেষ্টার শিকার একজন এবং পুড়িয়ে মারা হয়েছে ৩ জনকে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্‌স)-এর হিসেব অনুযায়ী গত ২০০১-০৮ পর্যন্ত দেশে ৬৪০ জন গৃহ শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে নিহত হয়েছেন ৩০৫ জন, পঙ্গু হয়েছেন ২৩৫ জন, ধর্ষিত হয়েছেন ৭৭ জন এবং অন্যভাবে নিগৃহীত হয়েছেন ২৩ জন। এ নির্যাতনের চিত্রই আমাদের বলে দেয়, কতটা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে গৃহশ্রমে নিয়োজিত শ্রমিকরা।

গৃহ শ্রমিক সুরক্ষা আইন : আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছি, সারাবিশ্বের অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমখাতের এই বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের কাজকে শোভনীয় করার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্বয়ং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) গত ১ জুন ২০১১ তার শততম অধিবেশনে গৃহ শ্রমিকদের বিষয়টিকে প্রধানতম অ্যাজেন্ডা হিসেবে গ্রহণ করে এবং ১৬ জুন ২০১১ গৃহকর্মীর অধিকার রক্ষায় একটি যুগান্তকারী সনদ পাস করে। নতুন সনদে গৃহ শ্রমিকদের অন্যান্য শ্রমিকের মতোই অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ সনদ অনুযায়ী, গৃহ শ্রমিকদের সঙ্গে এখন থেকে লিখিত চুক্তি করতে হবে। এছাড়া সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে এবং বার্ষিক ও অন্যান্য ছুটির দিনগুলোতে তাদের নিয়োগকারীর বাড়িতে থাকতে হবে না। সনদ প্রণয়নে বাংলাদেশও ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। প্রয়োজন শুধু অনুসমর্থন দানের। অনুসমর্থন না-করলে এ সনদের বিধিবিধান আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে না। বাংলাদেশ সরকার দ্রুতই এ সনদটি অনুসমর্থন করবে এবং গৃহ শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রের মানসম্মান সংরক্ষণে আরও তৎপর এবং উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে কিছু বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা ও সংগঠন বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গৃহ শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টি জাতীয় ও শ্রমিক আন্দোলনের মতোই মানবাধিকার আন্দোলনেও খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গেও গৃহশ্রমিকদের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টায় 'গৃহ শ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১০' শীর্ষক একটি খসড়া নীতিমালা প্রণীত হলেও দীর্ঘ দিন যাবৎ তা গুরুত্বহীন অবস্থায় পড়ে আছে। আন্তর্জাতিকভাবে গৃহ শ্রমিকদের জন্য একটি সনদ প্রণীত হওয়া এবং সেখানে সক্রিয় ভূমিকা রাখায় নিজের দেশেও একটি বাস্তবসম্মত আইন প্রণয়নে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ।

গৃহ শ্রমিকদের সমস্যা : গৃহশ্রমিকদের নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়- ১. কাজ হিসেবে গৃহশ্রমের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই; ২. গৃহশ্রমের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন বা নীতিমালা নেই;

দারিদ্র্যের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী গৃহশ্রমিকের কাজ বেছে নিয়েছে কিন্তু কোনো দয়া ভিক্ষা করেনি। পরিশ্রম করে তবেই পারিশ্রমিক নিচ্ছে। কিন্তু তারপরও তারা প্রতিমুহূর্তে শিকার হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের। যারা গৃহশ্রমিকের প্রতি বৈষম্য, শোষণ-নির্যাতন করে তারা কোনো পেশাদার অপরাধী নয় বরং অনেকেই শিক্ষিত এবং সমাজে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সদস্য। দীর্ঘকাল ধরে গৃহ শ্রমিকদের ভিন্ন চোখে দেখা বা বৈষম্যমূলক আচরণের যে চর্চা আমাদের সামজে বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মানসিকতায় তারই প্রতিফলন প্রতীয়মান হয়। এদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং গৃহ শ্রমিকদের প্রতি সংবেদনশীল করে তুলতে হবে।

গৃহ শ্রমিকরা যাতে সমাজে মানুষ হিসেবে মর্যাদা নিয়ে মানবিকভাবে বাঁচার অধিকার পায়। আমরা আর কোনো গৃহশ্রমিকের নির্যাতনের শিকার হয়ে লাশ হয়ে বাড়ি ফেরা দেখতে চাই না। কোনো নির্যাতিত গৃহশ্রমিকের আর্তনাদ শুনতে চাই না। আমরা চাই গৃহ শ্রমিক ও তাদের পেশার প্রতি সম্মান ও স্বীকৃতি।

৩. দেশে প্রচলিত শ্রমআইনে গৃহশ্রমের বিষয়টি উপেক্ষিত; ৪. গৃহশ্রম বিষয়ে কোনো জাতীয় মানদণ্ড বা আচরণবিধি নেই; ৫. গৃহ শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়; ৬. গৃহশ্রমিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন ও নীতিমালা নেই।

গৃহ শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হলো- ১. গৃহ শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে; ২. গৃহশ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সুনিশ্চিত ও সহজ করতে হবে; ৩. গৃহশ্রমের জন্য জাতীয় নীতিমালা ও ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠনের বিধান নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকের হাতেই মজুরি প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘনকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখতে হবে; ৪. গৃহশ্রমিকের জন্য সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বাৎসরিক ছুটি এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, যাতে সকলেই তাদের ধর্মীয় উৎসবের সময় তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে; ৫. গৃহ শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করা ও তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের প্রতি মানবিক ও সদয় আচরণ করতে হবে। গৃহ শ্রমিককে বাসায় আটকে রাখা অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে; ৬. গৃহশ্রমকে উৎপাদনশীল শ্রম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; ৭. গৃহশ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; ৮. শিশু গৃহ শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময় বিশ্রাম, বিনোদন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে; ৯. গণমাধ্যমে গৃহ শ্রমিকদের গুরুত্ব ও অবদান স্বীকার করে ইতিবাচক প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে মানুষ তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে; ১০. শিশু গৃহ শ্রমিকদের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, দারিদ্র্যের কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী গৃহশ্রমিকের কাজ বেছে নিয়েছে কিন্তু কোনো দয়া ভিক্ষা করেনি। পরিশ্রম করে তবেই পারিশ্রমিক নিচ্ছে। কিন্তু তারপরও তারা প্রতিমুহূর্তে শিকার হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের। যারা গৃহশ্রমিকের প্রতি বৈষম্য, শোষণ-নির্যাতন করে তারা কোনো পেশাদার অপরাধী নয় বরং অনেকেই শিক্ষিত এবং সমাজে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সদস্য। দীর্ঘকাল ধরে গৃহ শ্রমিকদের ভিন্ন চোখে দেখা বা বৈষম্যমূলক আচরণের যে চর্চা আমাদের সামজে বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মানসিকতায় তারই প্রতিফলন প্রতীয়মান হয়। এদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং গৃহ শ্রমিকদের প্রতি সংবেদনশীল করে তুলতে হবে। গৃহ শ্রমিকরা যাতে সমাজে মানুষ হিসেবে মর্যাদা নিয়ে মানবিকভাবে বাঁচার অধিকার পায়। আমরা আর কোনো গৃহশ্রমিকের নির্যাতনের শিকার হয়ে লাশ হয়ে বাড়ি ফেরা দেখতে চাই না। কোনো নির্যাতিত গৃহশ্রমিকের আর্তনাদ শুনতে চাই না। আমরা চাই গৃহ শ্রমিক ও তাদের পেশার প্রতি সম্মান ও স্বীকৃতি। আসুন আমরা গৃহ শ্রমিকদের দাস হিসেবে নয় বরং পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে গ্রহণ করি।

লেখক: সভাপতি, নাটোর জেলা, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন: শ্রমিকের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

সোহেল রানা মিঠু

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অধীনস্থ একটি সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ইতিহাস :

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়। আইনটি ১ অক্টোবর ২০০৬ সাল থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনটি ১৯৬৮ সালে প্রণীত কোম্পানী মুনাফা (শ্রমিকদের অংশগ্রহণ) আইনের আধুনিক সংস্করণ। আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও বাধ্যবাধকতার অভাবে যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়াও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ত্রয়োদশ বৈঠকে এ আইনটি সংশোধনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইনটি সংশোধন পূর্বক 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে আইনটির একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়।

ভিশন ও মিশন: বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন নির্দিষ্ট ভিশন ও মিশন রয়েছে। তা হলো:-

ভিশন : বাংলাদেশের সকল অঞ্চল ও স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

মিশন : সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে লভ্যাংশ প্রদান নিশ্চিত করে সকল অঞ্চল ও স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সেবার আওতায় আনা।

কর্মপরিধি :

শিল্পায়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক (এরূপ সরকারি ও বেসরকারি খাতে যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকরির শর্ত ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত) ও অপ্রাতিষ্ঠানিক (এরূপ বেসরকারি খাত যেখানে কর্মরত শ্রমিকের বা চাকরির শর্ত ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত) খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও শ্রমিকদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী :

- শ্রমিক ও তাঁর পরিবারের কল্যাণ সাধন;
- শ্রমিক ও তাঁর পরিবারের কল্যাণার্থে, বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন;
- শ্রমিকদের বিশেষতঃ অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;
- অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান;
- দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তাঁর পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান;
- শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান;
- শ্রমিকদের জীবন বীমাকরণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং এই লক্ষ্যে তহবিল হইতে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা;
- তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

ফাউন্ডেশনের তহবিল :

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফাউন্ডেশনের একটি তহবিল থাকবে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হতে প্রাপ্ত অর্থ তহবিলে জমা হইবে, যথাঃ-

ক. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

খ. মালিক কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

"শ্রম আইনের ধারা ২৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রতি বৎসর জমাকৃত অর্থের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ অর্থ;]"

গ. সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সুদবিহীন বা রেয়াতিহারে গৃহীত ঋণ;

ঘ. ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা থেকে প্রাপ্ত আয়;
ঙ. কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দানকৃত অর্থ;
চ. ফাউন্ডেশনের তহবিল বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা; এবং
ছ. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

"উপ-ধারা (২) এর দফা (খখ) তে উল্লিখিত অর্থ, শ্রম আইনের ধারা ২৪৩ এর উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্যেপূরণকল্পে, উক্ত শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে জমা হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে–তবে শর্ত থাকে যে, শ্রম আইন দ্বারা বিলুপ্ত Companies Profits (Workers Participation) Act, 1968 (Act No. XII of 1968) এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত তহবিল এবং শ্রম আইনের অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হইতে ইতোমধ্যে জমাকৃত অর্থ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তহবিলে এমনভাবে জমা থাকিবে যেন উহা এই উপ-ধারার অধীন জমা হইয়াছে।]"

৪. তহবিলের অর্থ বা তার অংশবিশেষ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাবে।
৫. তহবিলের অর্থ, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, ফাউন্ডেশনের নামে কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।
(৬) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল রক্ষণ ও তার অর্থ ব্যয় করা যাবে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন নিম্নোক্ত খাতসমূহে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে :

- মৃত শ্রমিক অনুদান
- ছাত্র বৃত্তি/শিক্ষা বৃত্তি (মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি ও বিশ্ববিদ্যালয়)
- জরুরি চিকিৎসা সহায়তা অন্যান্য

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ :

ভিশন: বাংলাদেশের সকল অঞ্চল ও স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

মিশন: সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে লভ্যাংশ প্রদান নিশ্চিত করত সকল অঞ্চল ও স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর সেবার আওতায় আনা।

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ
২.১) নাগরিক সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম বা অসমর্থ হলে অথবা তার মৃত্যু ঘটলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক অথবা তার পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান	চেকের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান প্রদান	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তর	বিনিময় মূল্য নেই	১ সপ্তাহ থেকে ৬ মাস	নাম: মোহাম্মদ আহম্মেদ আলী পদবি: উপ-পরিচালক (উপসচিব) ই-মেইল: blwf.mole@gmail.com ফোন: ৯৫৪৫৩১৫
২	দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	
৩	শ্রমিকের মেধাবী সন্তানের উচ্চ শিক্ষায় আর্থিক অনুদান প্রদান	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	
৪	কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিকের জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	যত তাড়াতাড়ি সম্ভব	
৫	অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে আর্থিক অনুদান প্রদান	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	
৬		-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	-ঐ-	

২.২) দাপ্তরিক সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	প্রশিক্ষণ প্রদান	ওয়ার্কশপ আয়োজন করে	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট	প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	নামঃ বেগম জেবুন্নেছা করিম পদবিঃ মহাপরিচালক ই-মেইলঃ blwf.mole@gmail.com ফোনঃ ৯৫৪৫৮৬৭
২	শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার্থে বিভিন্ন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে চিকিৎসক নিয়োগ	সরাসরি চিকিৎসকের মাধ্যমে	টিকেট প্রাপ্তিস্থান- সংশ্লিষ্ট শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র	৫ টাকার টিকেট	প্রতি কর্মদিবস	নামঃ বেগম জেবুন্নেছা করিম পদবিঃ মহাপরিচালক ই-মেইলঃ blwf.mole@gmail.com ফোনঃ ৯৫৪৫৮৬৭
৩	জনগণকে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের সেবা সম্পর্কে অবহিতকরণ	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট, লিফলেট, ব্যানার এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	সার্বক্ষনিক	নামঃ মোহাম্মদ আহম্মেদ আলী পদবিঃ উপ-পরিচালক (উপসচিব) ই-মেইলঃ blwf.mole@gmail.com ফোনঃ ৯৫৪৫৩১৫
৪	ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন সেবা প্রদান	অনুদান ফর্ম আপলোড, অনুদান প্রাপ্তদের নামের তালিকা হালনাগাদকরণ, লভ্যাংশ প্রদানাকরী কোম্পানীর নামের তালিকা হালনাগাদকরণ	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট	বিনিময় মূল্য	সার্বক্ষনিক	নামঃ নিয়ামত উল্লাহ পদবিঃ উপ-সহকারী ই-মেইলঃ blwf.mole@gmail.com ফোনঃ ৯৫৪৫৩১৫

২.৩) অভ্যন্তরীন সেবা

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	ছুটি প্রদান	প্রাপ্যতা অনুযায়ী দরখাস্তের মাধ্যমে	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের দপ্তর	প্রযোজ্য নয়	প্রাপ্যতা অনুযায়ী	নামঃ মোহাম্মদ আহম্মেদ আলী পদবিঃ উপ-পরিচালক (উপসচিব) ই-মেইলঃ blwf.mole@gmail.com ফোনঃ ৯৫৪৫৩১৫
২	প্রয়োজনীয় লজিস্টিক প্রদান	সরাসরি	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের দপ্তর	বার্ষিক বাজেট অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নাগরিক সেবাসমূহের সময় সীমা :

- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নাগরিককে তথ্য প্রদান (বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন) বিনামূল্যে সেবা প্রদানের সময়সীমা: ১৫ দিন
- কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা সকল শ্রমিক দৈহিক বা মানসিক স্থায়ী অক্ষম বা অসমর্থ হলে শ্রমিক আর্থিক অনুদান প্রদান (প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের ক্ষেত্রে) বিনামূল্যে সেবা প্রদানের সময়সীমা: ১৮০ দিন
- কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা সকল শ্রমিক দৈহিক বা মানসিক স্থায়ী অক্ষম বা অসমর্থ হলে শ্রমিক আর্থিক অনুদান প্রদান (অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের ক্ষেত্রে) বিনামূল্যেসেবা প্রদানের সময়সীমা: ১৮০ দিন
- দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আর্থিক অনুদান (প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের ক্ষেত্রে বিনামূল্যেসেবা প্রদানের সময়সীমা: ১৮০ দিন
- দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য আর্থিক অনুদান (অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের ক্ষেত্রে) বিনামূল্যেসেবা প্রদানের সময়সীমা: ১৮০ দিন
- শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় আর্থিক অনুদান প্রদান বিনামূল্যেসেবা প্রদানের সময়সীমা: ১৮০ দিন
- কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিকের জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান (প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের ক্ষেত্রে) বিনামূল্যেসেবা প্রদানের সময়সীমা: ১৮০ দিন
- কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিকের জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান (অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের ক্ষেত্রে) বিনামূল্যেসেবা প্রদানের সময়সীমা: ১৮০ দিন

● শ্রমিকের মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান বিনামূল্যেসেবা প্রদানের সময়সীমা: ১৮০ দিন
● অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে আর্থিক অনুদান প্রদান বিনামূল্যেসেবা প্রদানের সময়সীমা: ১৮০ দিন
● দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান (প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের ক্ষেত্রে) বিনামূল্যেসেবা প্রদানের সময়সীমা: ১৮০ দিন
● দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান (অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের ক্ষেত্রে) বিনামূল্যেসেবা প্রদানের সময়সীমা: ১৮০ দিন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে আবেদন করার নিয়ম :

● বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে আবেদন করতে হলে তাকে অবশ্যই বাংলাদেশের শ্রম বিভাগের বৈধ রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ফেডারেশন, ক্রাফট ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে হবে। তবে কোন শ্রম বিভাগের কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে।
● তিনি যদি কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য না হন তাহলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যায়ন পত্র বা সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
● যথাযথ কর্তৃপক্ষ বলতে কোন শ্রম বিভাগের কর্মকর্তা, অত্র এলাকার কোন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার পত্যায়ন পত্র থাকতে হবে যে তিনি একজন শ্রমিক।
● বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। (১) ফরম-'ক' (২) ফরম-'কক'
● আপনি যে ফেডারেশন, ক্রাফট ফেডারেশন, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য তার আইডিসহ যাবতীয় সাপোর্টিং পেপারস যুক্ত করতে হবে।
● যদি কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য না হন তাহলে কোন শ্রম বিভাগের কর্মকর্তা, অত্র এলাকার কোন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার প্রত্যায়নপত্র বা সার্টিফিকেটসহ যাবতীয় সাপোর্টিং পেপারস যুক্ত করতে হবে।

ফর্ম-'ক'

[বিধি ৪ (২) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ১ (এক) কপি ছবি

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন ফরম

বরাবর
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

আর্থিক সহায়তা চাওয়ার কারণ: (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে টিক দিন।)
(ক) দুর্ঘটনাজনিত কারণে দৈহিক ও মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষমতা (সর্বশেষ সময়সীমা বিগত ১০৫ দিনের মধ্যে হতে হবে);
(খ) দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু (সর্বশেষ সময়সীমা বিগত ১০৫ দিনের মধ্যে হতে হবে)
(গ) দুরারোগ্য চিকিৎসা;
(ঘ) মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকার;
(ঙ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণ;

বি: দ্র: মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে মৃত্যুসনদ এবং চিকিৎসাধীন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের মেডিকেল সার্টিফিকেট/চিকিৎসা ছাড়পত্র/চিকিৎসাপত্রের মূল কপি অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে।

১। শ্রমিকের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী:
(ক) নাম: ....
(খ) স্ত্রী/স্বামীর নাম: ....
(গ) পিতার নাম: ....
(ঘ) মাতার নাম: ....
(ঙ) জন্ম তারিখ: ....
(চ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্ম সনদ (সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে) : ....
(ছ) স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা: .... ডাকঘর: ....
থানা/উপজেলা: .... জেলা: ....
(জ) স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা: .... ডাকঘর: ....
থানা/উপজেলা: .... জেলা: ....

২। প্রাতিষ্ঠানিক (তৈরী পোষাক শিল্পের কারখানা ব্যতীত অন্যান্য অফিস, কলকারখানা, ইত্যাদি) খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে:
প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (নিয়োগপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে): ....
....

বি: দ্র: প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/কাউন্সিলর অথবা, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/কাউন্সিলর এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অথবা, এই সব অধিদপ্তরের অধিনস্ত কার্যালয়ের কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে।
(স্বাক্ষর, তারিখ, সীল এবং ফোন/মোবাইল নম্বর অবশ্যই থাকতে হবে):

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর

৩। অপ্রাতিষ্ঠানিক (কৃষি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, গৃহ শ্রমিক, রিকশা/ভ্যানচালক ইত্যাদি) খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী:
বর্তমান পেশা ও কর্মস্থল: ....

....

বি: দ্র: অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/কাউন্সিলর অথবা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অথবা, এই সব অধিদপ্তরের অধিনস্ত কার্যালয়ের কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে।
(স্বাক্ষর, তারিখ, সীল এবং ফোন/মোবাইল নম্বর অবশ্যই থাকতে হবে):

ফোন/মোবাইল স্বাক্ষর	ফোন/মোবাইল স্বাক্ষর

৪। যার জন্য আবেদন করা হচ্ছে: (স্থায়ীভাবে অক্ষম, শিশু, নির্ভরশীল বা মৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে):

(ক) আবেদনকারীর নাম: ....

(খ) স্ত্রী/স্বামীর নাম: ....

(গ) পিতার নাম: ....

(ঘ) মাতার নাম: ....

(ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্ম সনদ (সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে): ....

(চ) আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক : ....

(ছ) আবেদনকারীর ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা: .... ডাকঘর: ....

থানা/উপজেলা: .... জেলা: ....

টেলিফোন/মোবাইল নম্বর: ....

বি:দ্র: মৃত বা স্থায়ীভাবে অক্ষম শ্রমিকের যোগ্য উত্তরাধিকারী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বার বা পৌরসভার মেয়র/কাউন্সিলর বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত ওয়ারিশান সনদ থাকতে হবে।

৫। শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হতে ইতোপূর্বে আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকলে বিবরণ:

(ক) প্রাপ্তির তারিখ: .... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ: ....

(গ) প্রাপ্তির কারণ: ....

৬। সরকারি বা বেসরকারি কোন তহবিল বা উৎস হতে ইতোপূর্বে আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকলে তার বিবরণ:

(ক) প্রাপ্তির তারিখ: .... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ: ....

(গ) প্রাপ্তির কারণ: ....

৭। অন্য কোন তথ্য (যদি থাকে): ....

....

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করছি যে, এই আবেদনপত্রে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোনো তথ্য গোপন করি নাই।

আবেদনকারীর নাম স্বাক্ষর ও তারিখ

ফর্ম-'কক'

[বিধি ৪ (৪) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ১ (এক) কপি ছবি

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সন্তানদের
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হতে শিক্ষা সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন ফরম

বরাবর
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন
আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদন

উচ্চ শিক্ষা (সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অথবা সরকারি কৃষি, প্রকৌশল বা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়)।

১। শ্রমিকের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী:

(ক) নাম: ....

(খ) স্ত্রী/স্বামীর নাম: ....

(গ) পিতার নাম: ....

(ঘ) মাতার নাম: ....

(ঙ) জন্ম তারিখ: ....

(চ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্ম সনদ (সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে) : ....

(ছ) স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা: .... ডাকঘর: ....
থানা/উপজেলা: .... জেলা: ....

(জ) বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম/মহল্লা: .... ডাকঘর: ....
থানা/উপজেলা: .... জেলা: ....

২। প্রাতিষ্ঠানিক (তৈরী পোষাক শিল্পের কারখানা ব্যতীত অন্যান্য অফিস, কলকারখানা, ইত্যাদি) খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে:
প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা (নিয়োগপত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে): ....
....

বি: দ্র: প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনের অথবা, সংগঠনভুক্ত না হলে, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/কাউন্সিলর অথবা, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/কাউন্সিলর এবং শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অথবা, এই সব অধিদপ্তরের অধিনস্ত কার্যালয়ের কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে।
(স্বাক্ষর, তারিখ, সীল এবং ফোন/মোবাইল নম্বর অবশ্যই থাকতে হবে):

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর

৩। অপ্রাতিষ্ঠানিক (কৃষি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, গৃহ শ্রমিক, রিকশা/ভ্যানচালক ইত্যাদি) খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী:
বর্তমান পেশা ও কর্মস্থল: ....
....

বি: দ্র: অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/কাউন্সিলর অথবা, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট শ্রম অধিদপ্তর বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অথবা, এই সব অধিদপ্তরের অধিনস্ত কার্যালয়ের কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে।
(স্বাক্ষর, তারিখ, সীল এবং ফোন/মোবাইল নম্বর অবশ্যই থাকতে হবে)

ফোন/মোবাইল স্বাক্ষর	ফোন/মোবাইল স্বাক্ষর

৪। শিক্ষা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য শ্রমিকের সন্তানের তথ্যাবলী:

(ক) নাম: ....

(খ) জন্ম তারিখ: ....

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম: ....

(ঘ) অধ্যয়নরত শ্রেণি: ....

(ঙ) অর্জিত ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নম্বরপত্র ও সনদের সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে: ....

(চ) টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর : ....

(ছ) ব্যাংকের নাম ও ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নম্বর (যদি থাকে): ....

(জ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্ম সনদ (সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে: ....

প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক বা কর্মচারীর জন্য সুপারিশ (সুপারিশসহ স্বাক্ষর, তারিখ, সীল এবং ফোন/মোবাইল নম্বর আবশ্যিক থাকতে হবে) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশ (স্বাক্ষর, তারিখ, সীল ও ক্ষেত্র বিশেষে ঠিকানা থাকতে হবে)

ফোন/মোবাইল	স্বাক্ষর	ফোন/মোবাইল	স্বাক্ষর

৫। শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হতে ইতোপূর্বে আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকলে বিবরণ:

(ক) প্রাপ্তির তারিখ: .... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ: ....

(গ) প্রাপ্তির কারণ: ....

৬। সরকারি বা বেসরকারি কোন তহবিল বা উৎস হতে ইতোপূর্বে আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকলে তার বিবরণ:

(ক) প্রাপ্তির তারিখ: .... (খ) প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ: ....

(গ) প্রাপ্তির কারণ: ....

৭। অন্য কোন তথ্য (যদি থাকে): ....

....

আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক ঘোষণা করছি যে, এই আবেদনপত্রে বর্ণিত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং আমি কোনো তথ্য গোপন করি নাই।

আবেদনকারীর নাম স্বাক্ষর ও তারিখ

যোগাযোগ বা আবেদন পাঠানোর ঠিকানা :

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন
শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ভবন নং ৬, ২১তলা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
ফোনঃ ৯৫৪৫৪৯৫

শ্রমিকের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনে দেশে সক্রিয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা থেকে যে অর্থ সংগ্রহ হয় তাই হচ্ছে ফাউন্ডেশনের মূলধন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুটি তহবিল। একটি মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিল অপরটি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল। এ পর্যন্ত তহবিল দুটিতে জমা হওয়া অর্থের পরিমাণ ৭০০ কোটি টাকারও বেশি। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কবলে পড়লে বা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে বা পেশাগত কারণে কাজ করতে অক্ষম হয়ে গেলে এই তহবিল দুটি থেকে অর্থ সহায়তা দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এছাড়া অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসায়, পরিবারের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিতেও এ তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ অনুযায়ী এ তহবিল থেকে শিক্ষাবৃত্তি, যৌথ বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ, চিকিৎসায় সহায়তা, কোনো শ্রমিক মারা গেলে দাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সহায়তা, অক্ষম শ্রমিককে সহায়তা, দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকের পরিবারকে সাহায্য করা ও মাতৃত্ব কল্যাণ খাতে সহায়তা করা হয়। কেন্দ্রীয় তহবিলের নিয়ম অনুযায়ী, কোনো শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কবলে পড়লে বা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে বা পেশাগত কারণে কাজ করতে অক্ষম হয়ে গেলে সুবিধাভোগী কল্যাণ তহবিল থেকে তার পরিবারকে ২ লাখ টাকা অনুদান দেয়া হয়। একই পরিমাণ অর্থ পান কেউ চাকরিরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে বা দুর্ঘটনায় মারা গেলে বা অক্ষম হলে। এছাড়া অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসায়, পরিবারের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিতেও এ তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। ফাউন্ডেশনে সহযোগিতা চেয়ে দরখাস্ত করে মাসের পর মাসের ঘুরেও কোন সহযোগিতা পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী সাহায্যপ্রার্থীরা। তবে শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশা শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন শ্রমিকদের পাশে দাড়াবে এবং প্রয়োজনের সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবে।

তথ্য সূত্র:-

১.দফা (খখ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ০২ নং আইন) এর ৩(ক) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

২.উপ-ধারা (৩) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ০২ নং আইন) এর ৩(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

লেখক: কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

মহিলা বিভাগের সিরাত সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইসলামী শ্রমনীতিতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ রয়েছে : অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ দুনিয়ার কোনো ভ্রান্ত মানুষের দেখানো পথে হাসিল হবে না। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণের নিশ্চয়তা ইসলাম দিয়েছে। ইসলামী শ্রমনীতিতে শ্রমজীবীদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ রয়েছে।

তিনি গত ১লা অক্টোবর ২০২৩, (রবিবার) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মহিলা বিভাগ উদ্যোগে ভার্চুয়ালি আয়োজিত 'ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়ন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও মহিলা বিভাগের সাধারণ সম্পাদক রোজিনা আখতার-এর সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, উপদেষ্টা অধ্যক্ষ নুরুন্নিসা সিদ্দিকা, অধ্যাপক উম্মে নওরীন ও অ্যাডভোকেট সাবিকুন্নাহার মুন্নী। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক হাসিনা খাতুন।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, আখেরাতে সকল মানুষকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। দুনিয়ার জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খানু হিসাব দিতে হবে। যারা দুর্বল মেহনতি শ্রমিকদের ওপর জুলুম নির্যাতন করেছে তাদের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর যারা শ্রমজীবী মেহনতি মানুষদের সুখে-দুঃখে পাশে ছিল তারা সেদিন সম্মানিত হবে। মানুষের মনে আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের জবাবদিহির অনুভূতি না থাকলে তাদের দ্বারা অমায়িক ব্যবহার আশা করা যায় না। আর অমায়িক ব্যবহার সম্পন্ন মানুষ তৈরির জন্য ইসলাম ও ইসলামী শ্রমনীতি সমাজ রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করা জরুরি।

সেমিনারে অন্য বক্তারা বলেন, ইসলাম শ্রমের প্রতি উৎসাহ জুগিয়েছে এবং শ্রমকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছে। ঠিক একইভাবে শ্রমিকের কাজকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগে মজুরি পরিশোধ করতে হবে। শ্রমিকের শ্রম দ্বারা অর্জিত উপার্জনই শ্রেষ্ঠ উপার্জন।

সেমিনারে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে–

১. লাগামহীন বাজার দরের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

২. পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা, বয়স্ক ভাতা এবং রেশনিং-এর ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩. শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী সকল আইন বাতিল এবং সকল বন্ধ কল-কারখানা খুলে দিতে হবে।

৪. সকল বকেয়া পাওয়া পরিশোধ করতে হবে।

৫. অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. মাতৃত্বকালীন সুবিধা ৬ মাস নির্ধারণ এবং শিশু লালন কক্ষ, প্রশিক্ষিত নার্স থাকতে হবে।

৭. স্বাস্থ্যকর ক্যান্টিন, পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ, হাসপাতাল, আবাসন ও শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য উন্নতমানের স্কুল এবং যানবাহন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. যোগ্যতার ভিত্তিতে মহিলাদের পদ মর্যাদা দিতে হবে এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. ৭ কর্ম দিবসের মধ্যে বেতন-ভাতা পরিশোধ, ওভার টাইম ভাতা দ্বিগুণ এবং যখন তখন শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে।

১০. নিরাপদ কর্মস্থলের ব্যবস্থা এবং অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. মালিক-শ্রমিক সুন্দর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. ইবাদতের সুযোগসহ বিশ্রামের ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩. কোম্পানির লভ্যাংশ ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ এবং নিম্নতম মজুরি ২৪ হাজার টাকা এবং অতিরিক্ত প্রোডাকশনের নামে হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

১৪. প্রতি বছর ১০% হারে মহার্ঘ্য ভাতা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অঞ্চল পরিচালক বৈঠক অনুষ্ঠিত

শ্রমজীবী মানুষরা জীবিকার জন্য কঠিন সংগ্রাম করছে : আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে শ্রমজীবী মানুষরা আজ দিশেহারা। মূল্যস্ফীতির কারণে আজ বাজারে প্রতিটি জিনিসের দাম কয়েকগুণ বেড়েছে। শ্রমজীবী মানুষরা অনাহারে-অর্ধহারে জীবন অতিবাহিত করছে। জীবিকার জন্য তাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হচ্ছে।

তিনি গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৩, (শনিবার) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত অঞ্চল দায়িত্বশীল বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রব্বানী, লস্কর মো. তসলিম, কবির আহমেদ, মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া ও মনসুর রহমান প্রমুখ।

আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন, ক্ষমতাসীন সরকার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তারা জন দুর্ভোগ দেখতে পায় না। লক্ষ লক্ষ বনি আদম আজ যে করুণ অবস্থায় নিপতিত তার জন্য সরকারই দায়ী। তারা ক্ষমতা ধরে রাখতে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীদের পক্ষ নিয়েছে। বাজার নিয়ন্ত্রণ না করে অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট করে মুনাফা করার সুযোগ দিয়েছে। এসব ব্যবসায়ীরা চাল ডাল তেল হতে শুরু করে সব পণ্যের দাম কারসাজি করে বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে নিম্ন আয়ের মানুষরা পরিবার পরিজন নিদারুণ খাদ্য কষ্ট ভোগ করছে। অথচ সরকার নিশ্চুপ হয়ে আছে। তারা দাম বেধে দেওয়ার নামে সাধারণ মানুষের সাথে মশকরা করছে।

তিনি আরও বলেন, সরকার কথায় কথায় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কথা বলে দায় এড়ানোর চেষ্টা করে। পৃথিবীর অন্য সকল দেশ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে পারলেও সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা দেখছি আমাদের কৃষকরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ কৃষকের উৎপাদিত ফসল মধ্যস্বত্বভোগীরা চড়া দামে বিক্রি করে অধিক মুনাফা লাভ করছে। গরিব মেহনতি মানুষের পকেট ও পেট স্বস্তিতে না থাকলে দেশের উন্নয়নের কোনো মূল্য নেই। এই উন্নয়ন অর্থহীন। আজকে যারা এসব মানুষদের নিদারুণ কষ্ট দিচ্ছে কেয়ামতের ময়দানে নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। আজকের অপকর্মের জন্য কঠিন শাস্তিভোগ করতে হবে।

গার্মেন্টসসহ সকল প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন বর্তমান মজুরি দিয়ে শ্রমিকদের সংসার চলে না। অবশ্যই নতুন মজুরি কাঠামো গঠন করতে হবে। একই সাথে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শামসুল ইসলাম শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতাকর্মীদের অসহায় শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, নিজ নিজ সামর্থ্যের আলোকে শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট লাঘবে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা প্রয়োজনে খাবার ভাগাভাগি করে খাবো। কম খাবো কিন্তু কোনো শ্রমিক ভাইবোনকে অনাহারে জীবন অতিবাহিত করতে দিবো না।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার জন্য শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে : আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায় ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকল্প নেই। বর্তমান সরকার মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে দেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছে। দেশের এই দুর্দিনে দেশপ্রেমিক জনতাকে সংগ্রাম করতে হবে। বিশেষত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

তিনি গত ৪ই অক্টোবর ২০২৩, (বুধবার) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন আয়োজিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান-এর সঞ্চালনায় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, গোলাম রব্বানী, লস্কর মো. তসলিম, কবির আহমেদ, মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া ও মনসুর রহমান প্রমুখ।

আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ এক সংকটকাল অতিক্রম করছে। সাধারণ মেহনতি মানুষ সুখে নেই।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে তারা অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। জিনিসপত্রের আকাশছোয়া দামের কারণে শ্রমিকরা পরিবার-পরিজন নিয়ে অনাহারে-অর্ধহারে জীবন অতিবাহিত করছে। তারা সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও দুবেলা ঠিকমতো খেতে পারছে না। বাজারে গিয়ে মুখ অন্ধকার করে তাদের ফিরে আসতে হয়। চাল ডাল তেলের দাম তো বহু আগেই শ্রমিকদের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। এখন দেশে উৎপাদিত সবজির দামও চড়া। আবার কৃষকরা উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। মূলত সরকারের ছত্রছায়ায় একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে সাধারণ মানুষদের কষ্ট দিচ্ছে।

তিনি বলেন, মূলত বর্তমান সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়। তাই জনগণ সুখে না দুঃখে আছে, এটি তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। তারা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। গণমাধ্যমে প্রতিদিন সরকারের অবাধ দুর্নীতি-লুটপাটের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। তারা দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে বিভিন্ন দেশে বেগমপাড়া গড়ে তুলেছে। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, সকল দুর্নীতি লুটপাটের বিচার করতে হবে। দেশের টাকা দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শামসুল ইসলাম আরও বলেন, জালিম সরকারকে বিদায় করার কোনো বিকল্প নেই। আজকে দেশে আইনের শাসন নেই। মানুষের বাক স্বাধীনতা নেই। গণমাধ্যমের টুটি চেপে ধরা হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। আজকে সারাদেশের মানুষ বর্তমান সরকারের পতন চায়। সীমাহীন ব্যর্থ এই সরকারকে আর মানুষ চায় না। তারা তাদের অধিকার ফিরে পেতে চায়। তারা রাতে নয় দিনের বেলা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চায়।

কল্যাণ প্রকাশনীর নতুন ১১টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

শ্রমিক আন্দোলন গতিশীল করতে কল্যাণ প্রকাশনী ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখবে : আ ন ম শামসুল ইসলাম

কল্যাণ প্রকাশনীর চেয়ারম্যান সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেছেন, শ্রমিক আন্দোলনের মজবুতি অর্জনে শ্রমবান্ধব লেখকদের এগিয়ে আসতে হবে। শ্রমিকদের নানাবিধ সমস্যা সমাধান ও দেশগঠনে তাদের অসামান্য ভূমিকা সমাজের মানুষের কাছে তুলে ধরতে প্রচুর বই লিখতে হবে। লেখকদের শ্রমবান্ধব বই কল্যাণ প্রকাশনী প্রকাশ করতে প্রস্তুত আছে। আশাকরি কল্যাণ প্রকাশনীর প্রকাশিত বই শ্রমিক আন্দোলন গতিশীল করতে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখবে।

তিনি গত ৫ই অক্টোবর ২০২৩, (বুধবার) রাজধানীর একটি অডিটোরিয়ামে কল্যাণ প্রকাশনী আয়োজিত নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। কল্যাণ প্রকাশনীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জামিল মাহমুদ-এর সঞ্চালনায় এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন লেখক-পাঠক ও কল্যাণ প্রকাশনীর কর্মকর্তাবৃন্দ।

আ ন ম শামসুল ইসলাম বলেন, দেশের দুই তৃতীয়াংশ মানুষ শ্রমজীবী। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাদের কেউ খোঁজ খবর রাখে না। অথচ তাদের রক্ত ঘামে দেশের অর্থনীতি সচল থাকে। তাদের পরিশ্রমের বদৌলতে দেশ মজবুত অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর দাঁড়ায়। তাদের এই ভূমিকা নিয়ে কেউ কথা বলে না। লেখকদের প্রতি আমাদের আহ্বান হচ্ছে, আপনারা শ্রমজীবী মানুষের জীবন গবেষণা করুন। তাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাজের মানুষের কাছে তুলে ধরুন। আমরা মনে করি, সমাজ-রাষ্ট্র গঠনে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা নিয়ে অসংখ্য বই প্রকাশের সুযোগ আছে।

নতুন প্রকাশিত বইগুলো হচ্ছে, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান রচিত আল কাসিবু হাবিবুল্লাহ, অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান রচিত বিশ্ব নবীর পরিবারে ৩ গোলাম ও দারসুল হাদিস, অ্যাডভোকেট শেখ আনসার আলী রচিত মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারায় শ্রমিক আন্দোলন, ড. নূরুল ইসলাম রচিত প্রচলিত শ্রমনীতি বনাম ইসলামী শ্রমনীতি, অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান রচিত ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিক নেতৃত্ব ও অধীনদের সাথে আচরণে রাসুলুল্লাহ (সা.)এর সুন্নাহ, ড. জি এম শফিকুল ইসলাম রচিত রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘোষিত শ্রমনীতিতে শ্রমিকের অধিকার, হাফিজুর রহমান রচিত মানুষ পরিচয় : জীবনের ব্যাপ্তি ও পরিধি এবং কল্যাণ প্রকাশনী রচিত শ্রমিক সংকলন।

ফিলিস্তিনি মানুষের ওপর ইসরাইলের আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ফিলিস্তিনের গাজায় অবৈধ দখলদার ইসরাইলি বাহিনীর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। গত ১০ই অক্টোবর ২০২৩, (সোমবার) এক যৌথ প্রতিবাদ বার্তায় ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান বলেন, ইসরাইলী বাহিনী ফিলিস্তিনের মানুষের ওপর ন্যাক্কারজনক বিমান হামলা চালিয়ে শত শত বনি আদমকে হত্যা করেছে। আহত করেছে অসংখ্য মানুষকে। এ হামলার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। অবিলম্বে ফিলিস্তিনি মানুষের ওপর ইসরাইলের আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে।

নেতৃদ্বয় বলেন, ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ মুসলমানদের বৈধ আবাসভূমি ইহুদিদের অবৈধ বরাদ্ধ দিয়ে বিশ্বে এক অশান্তির জন্ম দিয়েছে। যা আজ ৭৫ বছর ধরে চলছে। ইতঃপূর্বে পবিত্র রমজান মাসে আল আকসা মসজিদে বর্বর ইসরাইলী বাহিনী গুলি চালিয়ে

হাজার হাজার মুসল্লিদের শহিদ করেছে। ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমির প্রতি ইঞ্চি জমিন আজ মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত। ইহুদিরা শুরু থেকে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে উৎসবে মেতে উঠেছে। আর তথাকথিত বিশ্বের শান্তিকামী সংগঠনগুলো চুপ থেকে ইহুদিদের অবৈধ কর্মকে বৈধতা দিয়েছে। ইসরাইলী বাহিনী মুসলমানদের আবাসভূমি দখল করার জন্য কয়েকদিন পর নতুন নতুন ইস্যু সৃষ্টি করেছে। তারা বিভিন্ন ইস্যুর দোহাই দিয়ে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের স্টিম রোলার চালিয়েছে। তারা সেখানে যে পরিমাণ ধ্বংসলীলা চালিয়েছে পৃথিবীতে এই রকম আর কোনো বর্বর বাহিনী করেনি। ইহুদিরা মুসলমানদের প্রথম কেবলা আল আকসা মসজিদ দখল করে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ইবাদত বন্দিগী থেকে বঞ্চিত করেছে। তারা মুসলমানদের মানবাধিকার কেড়ে নিয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষত ওআইসি কোনো ভূমিকাই রাখেনি। অথচ সবার চোখের সামনে দিনের পর দিন ইসরাইলের আক্রমণে শত শত নিরীহ মুসলমানকে জীবন দিতে হয়েছে। বাড়িঘর ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে জীবনযাপন করতে হয়েছে।

তারা বলেন, অতিসত্বর স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে হবে। এছাড়া এই সমস্যার অন্যকোনো পথ নেই। স্বাধীন-সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ওআইসি, জাতিসংঘ ও সর্বোপরি মুসলিম বিশ্বকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই বর্বর হামলার শক্ত প্রতিবাদ জানাতে হবে।

নেতৃদ্বয়, ইসরাইলী হামলায় নিহতদের শাহাদাত কবুলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ২৫ হাজার টাকা করতে হবে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য গঠিত নিম্নতম মজুরি বোর্ডের আগামী কালের (২২ অক্টোবর, রবিবার) সভায় শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন ২৫ হাজার টাকা চূড়ান্ত করার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

গত ২১ই অক্টোবর ২০২৩ (শনিবার) এক যৌথ বিবৃতিতে ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান গভীর উদ্বেগের সাথে বলেন, নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠনের চার মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলেও এখন পর্যন্ত কোনো পক্ষ মজুরি প্রস্তাবনা দেয়নি। তারা স্পষ্টত্ব সময়ক্ষেপণ করছে। অথচ শ্রমিকরা চলমান মূল্যস্ফীতিতে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছে। নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্যের কারণে পরিবার-পরিজন নিয়ে দুর্ভোগের মধ্যে আছে। এমন সময় বেতন-ভাতা বাড়ানোর নামে পোশাক খাতের শ্রমিকদের মাসের পর মাস ঘুরানো চরম অমানবিক।

নেতৃদ্বয় বলেন, প্রতিদিন জীবনযাত্রার ব্যয় হু হু করে বাড়ছে। করোনা পরবর্তী সময়ে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা যৌক্তিক হলেও তা করা হয়নি। স্বল্প বেতন-ভাতার সাথে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি শ্রমিকদের জীবনে চরম দুর্দিন ডেকে এনেছে। দেশের অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠন বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য বারংবার আহ্বান করলেও মালিকপক্ষ কার্যত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে সরকারও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণে এগিয়ে আসেনি। বরং তারা নীরব থেকে মালিকদের সমর্থন দিয়ে গেছে। সরকারের আর্শীবাদপুষ্ট মালিকরা অর্থ-সম্পদে বিত্তশালী হলেও শ্রমিকরা হয়েছে নিঃস্ব।

তৈরি খাতের পোশাক রফতানিতে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় হলেও শ্রমিকদের বেতন-ভাতা প্রদানে শীর্ষ দশে নেই। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর শ্রমিকদের তুলনায় দেশের শ্রমিকরা অনেক কম বেতন-ভাতা পেয়ে থাকে। বিদেশী ক্রেতা ও বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শ্রমিকদের বেতন দেখে অবাক বিস্ময়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছে। তারাও এই খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধির জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এমনকি তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছেও চিঠি দিয়ে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন। বিদেশীরা স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের দুর্দিন উপলব্ধি করলেও মালিকপক্ষ-সরকার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পোশাক শিল্পের বর্তমান অবস্থায় ২৫ হাজার টাকা বেতন-ভাতা কোনোভাবেই অযৌক্তিক না। বর্তমান বাজারে ৪ সদস্যের একটি পরিবারের মাসিক ব্যয় প্রায় ৩৫ হাজার টাকা। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সাথে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির মূল্যবৃদ্ধি এবং অস্বাভাবিকভাবে বাড়ি ভাড়া বাড়ছে। মালিকরা বেতন না বাড়ানোর জন্য নানা ইস্যুর অজুহাত দেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো যখন বিরূপ পরিস্থিতি ছিলো না তখন তারা স্বেচ্ছায় শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করেননি। বরং দিনের পর দিন শ্রমিকদের ঠকিয়ে গেছেন। শ্রমিকরা মালিকদের বা এই খাতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চান না। তাই বলে বছরের পর বছর শ্রমিকরা ঠকে যাবে। আর মালিকদের অর্থবিত্ত ফুলে ফেঁপে ওঠবে; এটাও প্রত্যাশা করা ঠিক না।

পণ্যের উৎপাদন তখনই বাড়বে যখন শ্রমিকরা সন্তুষ্ট মনে কাজ করতে পারবে। শ্রমিক-মালিক পরস্পর শত্রু না। তারা একে অপরের পরিপূরক। পোশাক শিল্পের আজকের উন্নতির পেছনে রয়েছে শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম। শ্রমিকরা সব সময় মুখ খুলতে পারে না। পেটের দায়ে সব নীরবে সহ্য করে যায়। কিন্তু আজ তাদের পেট দেয়ালে ঠেকে গেছে। এখন তাদের পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব না। সরকার ও মালিকপক্ষ মনে করছে আসন্ন নির্বাচনের আগে যৎ সামান্য মজুরি বৃদ্ধি করে শ্রমিকদের খুশি করে দিবে। আমরা স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি, নামকাওয়াস্তে বেতন বৃদ্ধিতে শ্রমিকরা সন্তুষ্ট হবে না। বরং এতে শ্রমিকদের দীর্ঘ দিনের জমে থাকা ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটবে। শ্রমিকরা ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য রাজপথে নেমে আসবে। যা সরকার ও মালিকপক্ষের জন্য সুখকর হবে না।

শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার মধ্যে মালিক ও সরকারের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আসন্ন নির্বাচনের আগে পোশাক শিল্পে কোনো অস্থিরতা সৃষ্টি হোক এটা আমরা চাই না। সুতরাং কোনো নয়ছয় না করে কালকের বৈঠকে পোশাক খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ২৫ হাজার নির্ধারণ ও দ্রুত কার্যকরের আহ্বান জানাচ্ছি।

গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের ওপর পুলিশের হামলার তীব্র নিন্দা ও নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি

অবিলম্বে পোশাক শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিন : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ন্যূনতম মজুরি ২৩ হাজার টাকা করার দাবিতে গাজীপুরে আন্দোলনরত পোশাক শ্রমিকদের ওপর পুলিশী আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

গত ৩০শে অক্টোবর ২০২৩, (সোমবার) এক যৌথ বিবৃতিতে ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান বলেন, গাজীপুরে পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা যখন ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে রাজপথে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিল, তখন পুলিশ অর্তকিত হামলা চালিয়েছে। পুলিশী হামলায় ইতোমধ্যে একজন শ্রমিক নিহত হয়েছে। অসংখ্য শ্রমিক আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশের এই হামলা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ও বেদনাদায়ক। শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের রাজপথে নেমে এসেছে। সেখানে পুলিশের উচিত ছিল তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সহায়তা করা।

নেতৃদ্বয় বলেন, শিল্প পুলিশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কী শ্রমিকদের নির্যাতন করার জন্য? যখনই শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে রাজপথে নেমে আসে তখনই শিল্প পুলিশ মালিক-সরকারের লাঠিয়াল বাহিনী হিসাবে হাজির হয়। তাদের বুলেটের আঘাতে ইতঃপূর্বে বহু শ্রমিক নিহত-আহত হয়েছে। আহত শ্রমিকরা কর্মাক্ষম হয়ে গিয়েছে। আজকেও পুলিশের গুলিতে একজন শ্রমিককে নিহত হতে হলো। এর দায়-দায়িত্ব কে নিবে আমরা জানতে চাই।

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি চলমান মুদ্রাস্ফীতিতে শ্রমিকের সংসার চলছে না। তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা অত্যাবশকীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু মালিক ও সরকার তাতে কর্ণপাত করছে না। সরকার নিজেদের পছন্দমত লোক দিয়ে তথাকথিত মজুরি বোর্ড গঠন করে শ্রমিকদের সাথে মশকরা শুরু করেছে। আমরা বলেছিলাম শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণ না হলে তারা অচিরে রাজপথে নেমে আসতে বাধ্য হবে। গাজীপুরের চলমান আন্দোলন আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করেছে। শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু মালিকরা যখন তাদের সেই দুমুঠো ভাত কেড়ে নিচ্ছে তখন আর এই শ্রমিকরা মালিকের পণ্য উৎপাদনের জন্য যেতে পারে না।

আমরা মালিকপক্ষকে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিচ্ছি, অবিলম্বে পোশাক শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিন। নিহত পোশাক শ্রমিক রাসেল হাওলাদারের পরিবারকে শ্রম আইন মোতাবেক ক্ষতিপূরণ দিন। যে সকল শ্রমিক আহত হয়েছে তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করুন। যে সকল পুলিশ শ্রমিকদের ওপর নির্দয়ভাবে হামলা চালিয়েছে তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনুন। যদি শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি না মানা হয় তাহলে আগামী দিনে শ্রমিকরা আরও কঠোর আন্দোলনে ধাবিত হলে এর দায় দায়িত্ব মালিক ও সরকারকে বহন করতে হবে।

ঢাকার মহাসমাবেশে আগত শ্রমিক নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

গ্রেফতারকৃত শ্রমিক নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি দিন : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ঢাকায় অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশ উপলক্ষ্যে সারাদেশ থেকে আগত শ্রমিক নেতাকর্মীদের গণহারে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

গত ২৯শে অক্টোবর ২০২৩, (রোববার) এক যৌথ বিবৃতিতে ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান বলেন, সভা-সমাবেশে যোগদান করা প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। পুলিশ ক্ষমতাসীন সরকারের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের তাগিদে পথে পথে চেকপোস্ট বসিয়ে সমাবেশে আগত নেতাকর্মীদের হয়রানি ও গণহারে গ্রেফতার চালিয়েছে। এখনো বহুসংখ্যক নেতাকর্মীদের গ্রেফতার দেখানো হয়নি। ফলে তারা কী অবস্থায় আছে আমরা জানি না।

নেতৃবৃন্দ গ্রেফতারকৃত শ্রমিক নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানান। তারা বলেন, বর্তমান সরকার দেশে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। আজ দেশে গণতন্ত্র কাগজে কলমে বন্দি হয়ে পড়েছে। আইনের শাসন ও মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে প্রশাসন যন্ত্রকে যচ্ছতচ্ছভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মানুষের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দেশের মানুষ এই স্বৈরাচারী শৃঙ্খল থেকে মুক্তি চায়। মানুষ যখন দলমত ভুলে গিয়ে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজপথমুখী হয়েছে, তখনই সরকারের ইশারায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিভিন্ন ঠুনকো অজুহাতে অসংখ্য নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষদের রাস্তাঘাট থেকে গ্রেফতার করেছে।

শুধু এখানেই শেষ নয় ঢাকার বিভিন্ন বাসা-বাড়ি ও হোটেলে অভিযান চালিয়ে ঢাকায় আগত বিভিন্ন সেবা প্রত্যাশী মানুষদের গ্রেফতার করেছে। অথচ একই সময়ে ক্ষমতাসীন সরকারের নেতাকর্মীদের কোনো ধরনের বাধা ছাড়াই ঢাকায় প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা পুলিশ প্রশাসনের এই দ্বৈতনীতির নিন্দা জানাচ্ছি।

আমরা পুলিশ প্রশাসনকে অতীতেও বারবার বলেছি, তারা জনগণের ট্যাক্সে টাকায় পরিচালিত রাষ্ট্রীয় বাহিনী। তারা কোনো সরকারের বা দলের অনুগত বাহিনী নয়। তা সত্ত্বেও আমরা দেখছি পুলিশের কিছু সদস্য সরকারের আনুকূল্য পাওয়ার চেষ্টায় নেমেছে। আমরা স্পষ্টভাষায় পুলিশ প্রশাসন উদ্দেশ্যে বলতে চাই, দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আপনারা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গ্রেফতারকৃত ৩১জন নেতাকর্মীসহ সকল রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দিন।

রাজধানী মিরপুরে পোশাক শ্রমিকদের ওপর পুলিশ ও আওয়ামী লীগের হামলার তীব্র নিন্দা

সময়ক্ষেপণ না করে পোশাক শ্রমিকদের দাবি মেনে নিন : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ন্যূনতম মজুরি ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত পোশাক শ্রমিকদের বিভিন্নস্থানে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

গত ৩১শে অক্টোবর ২০২৩, (মঙ্গলবার) এক যৌথ বিবৃতিতে ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান বলেন, গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্নস্থানে তৈরি পোশাক শ্রমিকরা আজকে ৮ম দিনের মত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলন তাদের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য গতকালকের মত আজকেও রাজধানীর মিরপুর ও গাজীপুরে পুলিশ-আওয়ামী লীগের কর্মীরা পোশাক শ্রমিকদের ওপর ন্যাক্কারজনক হামলা চালিয়েছে। আমরা এই হামলার নিন্দা জানাচ্ছি এবং মালিকপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি সময়ক্ষেপণ না করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পোশাক শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার।

নেতৃদ্বয় বলেন, তৈরি পোশাক খাতের মালিকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি'র আজকের সংবাদ সম্মেলন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে আমরা মনে করি বিজিএমই শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার বদলে শ্রমিকদের হুমকি দিয়ে কাজে ফেরানোর চেষ্টা করছে। এটি কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে না।

শ্রমিকদের দাবি পূরণে বিজিএমই আন্তরিক হলে শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি হতো না। শ্রমিকরা ধনী হতে চায় না। তারা দুবেলা দুমুঠো খেয়ে বাঁচতে চায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে মালিকরা চায় না শ্রমিকরা ভালোভাবে বেঁচে থাকুক। তারা শ্রমিকদের পিষে মারতে চায়। অথচ শ্রমিকদের দিনরাত পরিশ্রমের কারণে পোশাক শিল্প এতদূর পৌঁছিয়েছে। মালিকরা তা বেমালুম ভুলে গিয়েছে। শ্রমিকদের এই দুর্দিনে শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম মন্ত্রণালয়ের নিষ্ক্রিয়তা জাতি অবাক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে। শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তাদের হস্তক্ষেপ প্রত্যক্ষ করা যায়নি।

আমরা স্পষ্টভাষায় বলতে চাই, শ্রমিকরা বর্তমান বাজারের তুলনায় খুব সামান্য বেতন-ভাতা দাবি করেছে। এটি কোনো অন্যায্য দাবি না। মালিকরা উচ্চমূল্যে পোশাক রপ্তানি করলেও শ্রমিকের শ্রম মূল্য দিচ্ছে না। তারা নানা অজুহাত পেশ করে বছরের পর বছর শ্রমিকদের ঠকিয়ে আসছে। এই সময়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বাংলাদেশ থেকে কয়েকগুণ বেশি। শ্রমিকরা তাদের সম বেতন দাবি করেনি। তারা বেঁচে থাকার মত বেতন-ভাতা চেয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করি স্বল্প সময়ের মধ্যে মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিবে এবং শ্রমিকরা কাজে ফিরে যাবে।

রংপুরের পায়রাবন্দ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে হত্যার তীব্র নিন্দা ও সুষ্ঠু তদন্ত দাবি

ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুব হত্যার ইন্ধনদাতাদের শাস্তি দিতে হবে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর জেলার সহ-সভাপতি মাহবুবুর রহমান (৫৫) কে গত ৫ নভেম্বর রাতে কুপিয়ে হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন। নেতৃদ্বয় বলেন, হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক ইন্ধনদাতাদের শাস্তির দিতে হবে।

গত ৬ই নভেম্বর ২০২৩, (সোমবার) এক যৌথ বিবৃতিতে ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান বলেন, মাহবুবুর রহমান একজন আদর্শবান সমাজসেবক ছিলেন। সদ্য নির্বাচনে জনগণ তাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করেছে। নির্বাচন পরবর্তীতে স্বল্প সময়ে জনগণের সেবার মাধ্যমে তিনি জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হয়েছেন। অপরদিকে নির্বাচনে ও মাহবুবুর রহমানের আদর্শের কাছে পরাজিত স্বার্থান্বেসী মহল গভীর ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। তারা একজন মাদকাসক্তকে লেলিয়ে দিয়ে মাহবুবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। শুধুমাত্র গোষ্ঠীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এমন একজন নিরহংকার, সদালাপী ও পরোপকারী ব্যক্তিকে এতটা নির্দয়ভাবে হত্যা করতে পারে তা মানুষের জানা ছিল না। এই হত্যাকাণ্ডে পায়রাবন্দ ইউনিয়নের মানুষ হতবাক ও বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

আমরা এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে লুকিয়ে থাকা ব্যক্তিদের দ্রুত খুঁজে বের করার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। যারা এই ঘৃণ্য পথ বেছে নিয়েছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। আমরা মরহুম মাহবুবুর রহমানের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। একই সাথে মরহুমের স্বজনদের শোক কাটিয়ে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করছি। মরহুম মাহবুবুর রহমানের জানাজা নামাজ গত ৬ই নভেম্বর ২০২৩, (সোমবার) বিকাল ৩ টায় পায়রাবন্দ স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজা শেষে মরহুমকে তার জাফরপাড়ার গ্রামের বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

জানাজায় অংশগ্রহণ করেছেন ফেডারেশনের রংপুর মহানগরের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বেলাল, মহানগর উপদেষ্টা আনোয়ারুল ইসলাম, জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক গোলাম রব্বানী, দিনাজপুর জেলা উত্তরের আনোয়ারুল ইসলাম, উপদেষ্টা এনামুল হক, রায়হান সিরাজী, ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মো. আব্দুল গণি, সাধারণ সম্পাদক মো. বেলাল আবেদীন, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক শাহাদাত মাজেদীসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ।

বিরোধী দলের ডাকা ৭২ ঘন্টার অবরোধে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতাকর্মীদের গণহারে গ্রেফতারের নিন্দা

মেহনতি শ্রমিকদের নিঃশর্ত মুক্তি দিন
: শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বিরোধী দলের ডাকা ৭২ ঘন্টা অবরোধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের অর্ধশত নেতাকর্মীদের গণহারে গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

গত ১ লা নভেম্বর ২০২৩, (মঙ্গলবার) এক যৌথ বিবৃতিতে ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান বলেন, আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে পুলিশ গণহারে গ্রেফতার শুরু করেছে। খেটে খাওয়া মেহনতি শ্রমিকদের কোনো ধরনের মামলা ও অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বাসা-বাড়ি ও কর্মস্থল থেকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। আমরা পুলিশের এই ঘৃণ্য আচরণের প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং গ্রেফতারকৃত মেহনতি শ্রমিকদের নিঃশর্ত মুক্তির দেওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

তারা বলেন, পুলিশ রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের নামে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার শুরু করেছে। যা অনাকাঙ্ক্ষিত। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন কোনো রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম নয়। এটি শ্রমিকদের প্রাণ কেন্দ্র। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের মঞ্চ। এটি পুলিশের অজানা নয়। তা সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে পুলিশ শ্রমিকদের অন্তরে আঘাত দিয়েছে।

যে সকল নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে তারা প্রত্যেকই শ্রমিক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে রাজপথের সারথী। শ্রমিকদের সুখে-দুখে তারাই পাশে থাকে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য পুলিশ এসব দরদী শ্রমিকবান্ধব নেতাকর্মীদের টার্গেট করে গ্রেফতার শুরু করেছে। আজ পুলিশের কারণে শ্রমিকদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। যে সকল নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের পরিবার গুলো নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কারাগারে থাকার কারণে আজ সে সব পরিবারে চুলা জ্বালানোর মত অবস্থা নেই। তারা অনাহারে দিনাতিপাত করছে। আজ ছোট ছোট মাসুম বাচ্চারা বাবার প্রতিক্ষায় দিনগুনছে।

আমরা পুলিশ প্রশাসনের প্রতি স্পষ্টভাষায় বলতে চাই, সকল ধরনের গণগ্রেফতার বন্ধ করুন। সকল মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দেওয়া বন্ধ করুন। অতীতের সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করুন। যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের নিঃশর্ত মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। শ্রমিকদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করবেন না। তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ দিন। আপনারা ভুলে যাবেন না শ্রমিকদের গায়ের ঘামে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। তাদের পরিশ্রমের বদৌলতে আপনারা বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন। শ্রমিকদের অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করুন। তাদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন।

নিম্নতম মজুরি বোর্ডের প্রস্তাবিত ন্যূনতম মজুরি প্রত্যাখ্যান ও তীব্র প্রতিবাদ

নিম্নতম মজুরি বোর্ড বাস্তবতা বিবর্জিত প্রস্তাবনা দিয়েছে
: শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জন্য প্রস্তাবিত মজুরি প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

গত ৭ই নভেম্বর ২০২৩, (মঙ্গলবার) এক যৌথ বিবৃতিতে ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান বলেন, নিম্নতম মজুরি বোর্ড বাস্তবতা বিবর্জিত প্রস্তাবনা দিয়েছে। অবিলম্বে এই প্রস্তাবনা প্রত্যাহার করতে হবে। মেহনতি শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে। নেতৃদ্বয় বলেন, নিম্নতম মজুরি বোর্ড মালিকপক্ষের প্রস্তাবিত অযৌক্তিক প্রস্তাবনা মেনে নিয়েছে। তারা শ্রমিকদের দুর্দশা আমলে না নিয়ে কেবল মালিকদের স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হয়েছে। তারা দফায় দফায় বৈঠকের নামে সময়ক্ষেপণ করেছে। তাদের এই অযৌক্তিক প্রস্তাবনা তৈরি পোশাক শিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টি করবে।

তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। দেশের রপ্তানি আয়ের ৮৩ শতাংশ আসে এই খাত থেকে। দুঃখজনক হলেও সত্য তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় হলেও মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে শীর্ষ দশের মধ্যে নেই। বাংলাদেশের শ্রমিকরা ভারত, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, পাকিস্তানের তুলনায় কমপক্ষে ১০০ ডলার কম বেতন পেয়ে আসছে। অথচ পোশাক ক্রেতারা প্রায় সমমূল্যে বাংলাদেশ থেকে পোশাক ক্রয় করে। বিদেশী ক্রেতারা দেশের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও দুর্দশা পর্যবেক্ষণ করে হতবাক হয়ে গিয়েছে। তারা শ্রমিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য মালিকদের বারবার তাগাদা দিলেও মালিকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে চুপ হয়ে যায়। মালিকদের দেওয়া অজুহাত ধোপে টিকে না। কারণ মালিকরা সরকার থেকে নানাবিধ সুবিধা পেয়ে আসছে। যা দেশের অন্যান্য শিল্প পায় না। অথচ সে শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিকরা পোশাক শ্রমিকদের থেকে বেশি বেতন-ভাতা পেয়ে আসছে।

২০১৮ সালে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি করা হয়েছিল ৮ হাজার টাকা। যা সে সময়ের জন্য যৌক্তিক ছিল না। তা সত্ত্বেও শ্রমিকরা দেশের স্বার্থে কাজ চালিয়ে গিয়েছে। আজকে শ্রমিকদের পীঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। দেশের ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতিতে নিত্যপণ্যের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। আজকে শ্রমিকদের ঘরে ৩ বেলার খাবার নেই। থাকার জন্য এখনো শহরের ঝুপড়ি ঘরকে বেছে নিতে হচ্ছে। চিকিৎসা, সন্তানের শিক্ষা মুখ থুবড়ে পড়েছে। সঞ্চয় বলতে কিছুই নেই। এমন দুর্দিনে ন্যূনতম মজুরি ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা শ্রমিকদের পীঠে ছুরিকাঘাতের সমান। আমরা স্পষ্টভাষায় বলতে চাই, সকল তামাসা বন্ধ করে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিতে হবে। অন্যান্য দেশের ন্যায় শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। শ্রমিকদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্যথায় শ্রমিকরা নিজেদের দাবি পূরণে আগামী দিনে কঠোর আন্দোলনে ধাবিত হলে সরকার ও মালিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গাজীপুরে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশের হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

নারী শ্রমিককে হত্যাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত ন্যূনতম মজুরি প্রত্যাখান করে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশের নির্বিচারে হামলা ও গুলি করে নারী শ্রমিক আঞ্জুয়ারা খাতুন (৩০) কে হত্যার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন।

গত ৮ই নভেম্বর ২০২৩, (বুধবার) এক যৌথ বিবৃতিতে ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান বলেন, অবিলম্বে নারী শ্রমিককে হত্যাকারীকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

নেতৃদ্বয় বলেন, পুলিশ বিনা উস্কানিতে শ্রমিকদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে। শ্রমিকরা ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকদের দাবি পূরণ না করে মালিকরা পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে আন্দোলন বন্ধ করার অপ্রয়াস চালিয়েছে। অতীতেও মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি বারংবার অস্বীকার করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য পুলিশের ওপর ভর করেছিল। আজকেও একই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এই হত্যার দায় পুলিশের পাশাপাশি মালিকদের বহন করতে হবে। পুলিশ কার নির্দেশে গুলি চালিয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত করে নির্দেশ দাতার শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। মালিক ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যে সব শ্রমিকরা পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে তাদের চিকিৎসার ব্যয়ভার রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির আন্দোলন পুলিশ দিয়ে ঠেকানোর সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

আমরা বারংবার বলে আসছি, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণ না হলে সারাদেশে গণবিস্ফোরণ ঘটবে। ন্যায্য দাবি পূরণের জন্য শ্রমিকরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রস্তুত। শ্রমিকরা কারো রক্তচক্ষুকে ভয় করে না। বছরের পর বছর শ্রমিকরা শুধু মুখ বন্ধ করে সকল শোষণ-নির্যাতন সহ্য করে যাবে, এই ভাবনায় যারা করছেন তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন। যে আন্দোলনে শ্রমিকদের রক্ত ঝড়েছে সেই আন্দোলন সফল করে শ্রমিকরা ঘরে ফিরে যাবে।

আমরা স্পষ্ট করে বলছি, শ্রমিকদের সকল ন্যায্য দাবি সময় থাকতে মেনে নিন। শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। শ্রমিকদের নাগরিক ও মৌলিক অধিকার কেড়ে নিবেন না। তাদের সাথে বসুন। তারা মালিকদের থেকে থেকে এক পয়সা বেশি মজুরি দাবি করে না। মনে রাখবেন, অতীতে শ্রমিকদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে কেউ ক্ষমতার মসনদ ধরে রাখতে পারেনি। এটি ভুলে যাবেন না। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মেহনতি মানুষের মনের ভাষা বোঝার চেষ্টা করুন। দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা ঘোষণা করুন।

গাজীপুরে পুলিশের গুলিতে আহত জালাল উদ্দিন-এর ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ

জালাল-আঞ্জুয়ারাসহ শ্রমিক হত্যাকারীদের শাস্তি দিতে হবে : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে গত ৮ নভেম্বর গাজীপুরের কোনাবাড়ি এলাকায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের চলমান আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে আহত জালাল উদ্দিন (৪০) গত ১২ই নভেম্বর (শনিবার) দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টায় ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। তার ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান।

গত ১২ই নভেম্বর ২০২৩, রবিবার এক যৌথ বিবৃতিতে, নেতৃদ্বয় মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। তারা প্রত্যাশা করেন শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আন্দোলনে শহীদ মরহুম জালাল উদ্দিন কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করবেন। নেতৃদ্বয় মরহুমের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

নেতৃদ্বয় বলেন, জালাল উদ্দিন, আঞ্জুয়ারা খাতুন ও রাসেল হাওলাদার রাষ্ট্রীয় হত্যার শিকার। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের হত্যা করা হয়েছে। অবিলম্বে জালাল-আঞ্জুয়ারাসহ সকল পোশাক শ্রমিক হত্যাকারীদের আইনের আওতায় আনতে হবে। খুনিদের কোনো ক্ষমা নেই। তাদের অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে।

তারা বলেন, শ্রমিকরা তো কোনো অন্যায় আবদার করেনি। তারা তাদের ন্যায্য মজুরি মালিকদের কাছে দাবি করেছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে পুলিশ দিয়ে শুধুমাত্র গাজীপুরের মাটিতে ৩জন শ্রমিককে দিনে-দুপুরে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে। এখন পর্যন্ত শ্রমিক হত্যার সাথে জড়িত কাউকে গ্রেফতারের ন্যূনতম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। আমরা পুলিশের এই অপকর্মের নিন্দা জানাই।

তারা বলেন, প্রধামন্ত্রীর আহবান শ্রমিকরা প্রত্যাখান করে রাজধানীর মিরপুরসহ বিভিন্নস্থানে শ্রমিক আন্দোলন অব্যাহত আছে। আজকের বাজারে ১২৫০০ টাকায় সংসার কোনোভাবেই চালানো সম্ভব নয়। তা জানা সত্ত্বেও কাঁচের গ্লাসের আড়ালে বসে শ্রমিকদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে একদল সরকার সমর্থক মানুষ অবাস্তব বেতন-ভাতার প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা আন্দোলন শুরুর আগেই থেকে বলে আসছি, শ্রমিকরা মালিক হতে চায় না। তারা দুবেলা দুমুঠো খেয়ে পরে বাঁচতে চায়। এটি তাদের সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকার। কিন্তু রাষ্ট্র শ্রমিকদের সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়নের থেকে শ্রমিকের বুকে গুলি চালাতে বেশি পারঙ্গম। আমরা সরকার ও মালিকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, নিহত শ্রমিকদের রক্তের দাগ মুছে যাওয়ার আগেই তাদের খুনিদের বিচার করুন। শ্রমিকদের সকল ন্যায্য দাবি মেনে নিন। সদ্য বন্ধকৃত সকল কারাখানা খুলে দিন। শ্রমিকদের আপন ভাবুন, তারা তো আপনাদেরই ভাই-বোন।

কল্যাণ প্রকাশনীর সকল বই

৩০% ছাড়ে পাওয়া যাচ্ছে

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/প্রকাশক	মূল্য
০১	আল কাসিবু হাবিবুল্লাহ	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	৪৫/-
০২	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান	৬৫/-
০৩	শ্রমিক সংকলন	কল্যাণ প্রকাশনী	১৬০/-
০৪	প্রচলিত শ্রমনীতি বনাম ইসলামী শ্রমনীতি	ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম	৭০/-
০৫	রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘোষিত শ্রমনীতিতে শ্রমিকের অধিকার	ড. জি.এম শফিকুল ইসলাম	২২/-
০৬	অধীনদের সাথে আচরণে রাসুলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাহ	এডভোকেট আতিকুর রহমান	৪০/-
০৭	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২৫/-
০৮	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১৫০/-
০৯	শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আযম	২৫/-
১০	মাওলানা মওদুদীর চিন্তাধারায় শ্রমিক আন্দোলন	এডভোকেট শেখ আনছার আলী	৪০/-
১১	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব	অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান	২৫/-
১২	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৩	আল কুরআনের পাতায় শ্রম, শ্রমিক ও শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২৫/-
১৪	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৭/-
১৫	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	কল্যাণ প্রকাশনী	২৫/-
১৬	ট্রেড ইউনিয়নের প্রাথমিক গাইড	কল্যাণ প্রকাশনী	৬০/-
১৭	ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক	এডভোকেট আতিকুর রহমান	৪০/-
১৮	শ্রমিক নেতৃত্ব	এডভোকেট আতিকুর রহমান	৭০/-
১৯	মানুষ পরিচয়-জীবনের ব্যাপ্তি ও পরিধি	মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান	১৩৫/-
২০	বিশ্ব নবীর পরিবারে তিনজন গোলাম	অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান	৩২/-
২১	ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা	রোকেয়া আনছার	৫০/-
২২	বিশ্বনবীর ঘোষিত শ্রমনীতি	অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান	১২/-
২৩	দারসুল কুরআন	অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান	১১০/-
২৪	দারসুল হাদিস	অধ্যাপক মাওলানা হারুনুর রশিদ খান	১৫০/-
২৫	গঠনতন্ত্র	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৭/-
২৬	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৭/-

কল্যাণ প্রকাশনী

৪৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

যোগাযোগ : ০১৭১২-৭৭০৭৩৩, ০১৮৩৬-০৮৬৯৮৪

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...

আবাবিলে স্বাগত

হে কাবার মেহমান

যারা ২০২৪ সালে হজ্জব্রত পালন করতে ইচ্ছুক, তারা এখনই নিবন্ধন করে হজ্জে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন।

প্যাকেজ আলোচনা সাপেক্ষে।

আপনি কি ২০২৫ সালে
পবিত্র হজ্ব পালন করার নিয়ত করেছেন?
তাহলে আজই প্রাক নিবন্ধন নিশ্চিত করুন।

ওমরাহ কার্যক্রম নিয়মিত চলছে প্রতি সপ্তাহেই ফ্লাইট

জোনাল যোগাযোগ

বগুড়া : ০১৭১৪৪৯৫২১৭, ০১৭৪০৫৯৮০৭৮
রাজশাহী : ০১৭১৬৩৩৪৭৪৬
বাগেরহাট, খুলনা : ০১৭১৭১২৮৫০০
সাতক্ষীরা : ০১৭১৩৯১৮৮৯৭
ঝিনাইদহ : ০১৯১৫৮৮৭৭৩০, নওগাঁ : ০১৭১৪৫৮৭২৫৭, বরিশাল : ০১৭১৪৭৪৫৩৩০
কুমিল্লা : ০১৮১৯১৩৬৫৫৬, নেত্রকোনা : ০১৭৩৪২০২২৫৯, মোহাম্মদপুর : ০১৭১৪০৪৬৩৪৫
উত্তরা/গাজীপুর : ০১৭১৮৯৫০৮৬৮, তেজগাঁও : ০১৬২৬৬৫৯৬৯৮

বিশ্বের যেকোনো দেশের বিমান টিকিট পাওয়া যায়

শুভেচ্ছান্তে
আলহাজ্ব মোঃ আবু ইউসুফ

Member of ATAB
IATA
Biman Bangladesh Airlines

আবাবিল হজ্জ গ্রুপ

ওমরাহ্ লাইসেন্স নং-৫১৪ • হজ্জ লাইসেন্স নং-৬২০

৫৫/এ সিদ্দিক ম্যানশন (৬ষ্ঠ তলা), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফোন : +৮৮-০২২২৬৬৩৮০৩০
মোবা : ০১৭০৫-৩৪০৬২৬, ০১৮৩২-৯৫৬৯৭৪